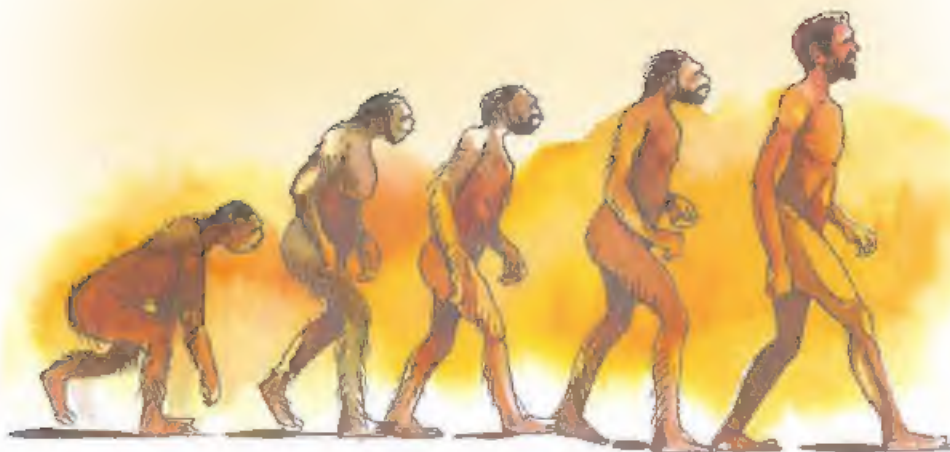


অতীত ও ঐতিহ্য

ষষ্ঠ শ্রেণি



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬



ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্মম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে; আমাদের গণপরিষদে, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত ষষ্ঠশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক অতীত ও ঐতিহ্য প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অতীত ও ঐতিহ্য বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্র প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা তালিকা ও রেখচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বাশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

অতীত ও ঐতিহ্য বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ

ডিসেম্বর, ২০১৭

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম অতীত ও ঐতিহ্য। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি ‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আলাদা বিষয় হিসেবে ইতিহাস-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পাচ্ছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই অতীতের বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী— ‘ভেবে দেখো খুঁজে দেখো’। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে ‘শিখন পরামর্শ’ অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অত্রিক রত্নরদার
চেয়ারম্যান
‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

অনির্বাণ মণ্ডল

কৌশিক সাহা

প্রদীপ কুমার বসাক

সত্যসৌরভ জানা

সঞ্জয় বড়ুয়া

সুগত মিত্র

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজি

অলংকরণ : প্রণবেশ মাইতি ও সুব্রত মাজি

মানচিত্র নির্মাণ : হিরাব্রত ঘোষ

মুদ্রণ সহায়তা : অনুপম দত্ত ও বিপ্লব মণ্ডল

গূঢ়পিণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ইতিহাসের ধারণা	২
২. ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ : যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন	১৬
৩. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা : প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ	২৮
৪. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা : দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ	৪৪
৫. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ : রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন - উত্তর ভারত	৬৪
৬. সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ	৭৮
৭. অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ	৯৮
৮. প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক : শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প	১১০
৯. ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত	১৩২

✍ তোমার পাতা

✍ শিখন পরামর্শ



বছরের শুরুতে একটা নতুন বই। ইতিহাসের বই। অনেকেই হয়তো ভাবছে যে ইতিহাস খুব পড়তে হবে। মুখস্থ করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনেক নাম, সাল-তারিখ। অথচ, যদি গল্পের মতো সহজে পড়া যায় ইতিহাস বইটা? যদি থাকে অনেক ছবি, মজার কথা, অজানা কথা। তাহলে আনন্দ করে পড়া যায় ইতিহাস বই। ইতিহাস শব্দের একটা মানে পুরোনো দিনের কথা। আর পুরোনো দিনের কথা শুনতে নিশ্চয়ই তোমরা ভালোবাসো। চলো দেখা যাক, গল্পের মতো মজা পাওয়া যায় কিনা ইতিহাস পড়ে।

ক্রাস ফাইভের আমাদের পরিবেশ বইতে রুবির দাদুর কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়। দাদু একদিন রুবির বন্ধুদের বাড়িতে ডাকলেন। বিকালে দলবেঁধে গেল সবাই দাদুর কাছে। গল্পের মাঝখানে দাদু উঠে গিয়ে তিনটে জিনিস নিয়ে এলেন। একটা পাথরের শিলনোড়া। একটা লোহার হামানদিস্তা। আর একটা মেশিন। পলাশ জানতে চাইল, মেশিনটা কী কাজে লাগে? দাদু বললেন, এটা দিয়েও মশলাপাতি বাটা যায়। এটা বিদ্যুতে চলে। একে মিকসার মেশিন বলে। রিয়া বলল, এটা তো আগে কখনও দেখিনি। দাদু বললেন, আমাদের ছোটবেলায়ও এই মেশিন দেখিনি। শুধু শিলনোড়া আর হামানদিস্তা দেখেছি। তখন অবশ্য পাথরের হামানদিস্তাও ছিল।



১.১ | কবে, কেন, কীভাবে, কোথায়?

স্কুলে একদিন পাথর আর ধাতুর ব্যবহার নিয়ে কথা হচ্ছিল। সালাম তখন বুবির দাদুর গল্পটা দিদিমণিকে বলল। শূনে দিদিমণি বোর্ডে শিলনোড়া, হামানদিস্তা আর মিকসাব মেশিনেব ছবি আঁকতে বললেন। পৃথা আঁকল দিদিমণি এবাব তন্ময়কে ডাকলেন। জানতে চাইলেন, বলোতো এই তিনটির মধ্যে কোনটির ব্যবহার মানুষ আগে শিখেছে? তন্ময় বলল, শিলনোড়াব ব্যবহাব। কাবণ পাথবেব ব্যবহাব মানুষ আগে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, তাবপবে কোনটা? সালাম বলল, ধাতুব হামানদিস্তা। পাথবেব পবে মানুষ ধাতুব ব্যবহাব শিখেছে। তবে দাদু বলেছেন, আগে পাথবেব হামানদিস্তাও ব্যবহাব হতো। দিদিমণি বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন। অনেক পুৰোনো দিনেও মানুষ পাথবেব হামানদিস্তাব ব্যবহাব জানত। আজও কিন্তু পাথবেব হামানদিস্তা ব্যবহাব করা হয়। পৃথা বলল, তাহলে মিকসাব মেশিন এসেছে সব শেষে। কাবণ বিদ্যুতেব ব্যবহাব মানুষ অনেক পরে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসেব গল্পেব গোড়ার কথা। কোনটা আগে, কোনটা পরে। মানে সময়ের হিসাবে কবে কোনটা এসেছে সেটা প্রশ্ন করা। মানুষ, ঘটনা বা জিনিস — সেটা কবে এল? এর সঙ্গে তোমবা আরেকটা কাজ করলে। কেন এই তিনটে জিনিস আগে-পরে এসেছে তার কাবণটাও বললে। আগে পবে হওয়াব কাবণ, মানে কেন আগে ও পরে সেটা জানতে হবে। ইতিহাসেব গল্পেব পবেব ধাপ এটাই। অবুণ বলল, তাবপরের ধাপ কী? দিদিমণি বললেন, এবাবে প্রশ্ন কবতে হবে, কীভাবে? মানে, কীভাবে মানুষ পাথবেব শিলনোড়াব ব্যবহাব শিখল? আবাব কীভাবে ধাতুব হামানদিস্তা বানাতে পারল? সেইসঙ্গে জানতে হবে এসব কাজ কোথায় হলো। কাবণ, এক জায়গায় কিছু মানুষ একটা সময়ে একবকম কাজ কবত। আবাব অন্য জায়গায় অন্য মানুষ ঐ একই সময়ে অন্যবকম কাজ কবত। তাই কবে, কেন, কীভাবে, কোথায় দিয়েই ইতিহাসের গল্প শুরু হয়।



অনেক অনেক দিন আগের কথা

টুকরো কথা

নদীমাতৃক সভ্যতা

সেই কবে থেকেই মানুষ নদীৰ ধাৰে থাকতে শুরু কৰেছিল। নদীকে ঘিরেই তাদের বোজকাৰ বৈশিষ্ট্যৰাজ চলত। পুরোনো দিনেৰ অনেক সভ্যতা (সভ্যতা কাকে বলে তা জানবে তৃতীয় অধ্যায়ে) নদীৰ উপৰি নির্ভৰ কৰেই তৈরি হয়েছিল। সেইসব সভ্যতাৰ কাছনদীছিল মায়েৰ মতো। তাই সেগুলিকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়। মাতৃক মানে মায়েৰ মতো। সেখানকাৰ লোকজনেৰ কাজকৰ্মে নদীৰ গুৰুত্ব ছিল সবথেকে বেশি।

শ্যামল একটা গল্পেৰ বইতে পড়েছিল, অনেক অনেক দিন আগে ওখানে জঙ্গল ছিল না। সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। শ্যামলেৰ মনে হয়েছিল, অনেক অনেক দিন আগের কথা জানা যায় কীভাবে? ইতিহাস ক্লাসে ও দিদিমণিকে সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, অনেক অনেক দিন আগের কথা সবটা জানা যায় না। পুরোনো দিনের লেখা পড়ে, ছবি দেখে জানা যায় কিছু কথা। বয়স্ক মানুষদের কথা শুনে কিছুটা জানা যায়। তবে যদি খুব পুরোনো দিন হয়? যে সময়ের ছবি নেই, লেখা নেই? যে সময়ের কোনো মানুষ আজ বেঁচেও নেই? সেইসব দিনেৰ অনেক কথাই ইতিহাসেৰ বই পড়ে জানা যায়। আবার গল্পেও অনেক পুরোনো দিনের কথা লেখা থাকে। তবে মনে রেখো, গল্পেৰ বইতে লেখা পুরোনো দিনের সব কথাই ইতিহাস নয়। ধৰো, বৃপকথাৰ গল্পে তোমরা ডানাওলা পক্ষীৰাজ ঘোড়ার কথা পড়ো। তেমন ঘোড়া কিন্তু অনেক দিন আগে ছিল না। সেটা মানুষেৰ মনেৰ কল্পনা। ইতিহাসেৰ কথা তেমন মনগড়া নয়। তাই পুরোনো দিনের যেসব কথা গল্পে থাকে, তা সবসময় ইতিহাস নয়। ধৰো, আদিম মানুষ ডানাওলা ঘোড়ায় চড়ে উড়ে বেড়াত। এমন কথা কোনো ইতিহাস বইতে লেখা থাকবে না। তাই ইতিহাসেৰ কথা গল্পেৰ মতো হলেও, সত্যি।

১.২ ইতিহাসের কথা, মানুষের কথা

আবার একদিন বিকালে সবাই মিলে গেল বুবিব দাদুর কাছে। দাদুকে বলল দিদিমণি গল্প আর ইতিহাস নিয়ে কী বলেছেন। দাদু বললেন, তাইতো গল্পেৰ বইতে শুধু বলা থাকে অনেক অনেক দিন আগের কথা। কবেকাৰ কথা সেটা ঠিকমতো বলা থাকে না। কিন্তু ইতিহাস বইতে কোনো না কোনো সময়ের হিসাব থাকে।

অবুগ বলল, আচ্ছা, দাদু ইতিহাসে খালি মানুষের কথাই বলা থাকে কেন? দাদু বললেন, মানুষ ছাড়া আর কেউ যে পুরোনো দিনের কথা জানতে চায় না। বাঘ সিংহ, গোরু ছাগলদের তো বাবার নাম, মায়েৰ নাম, ঠাকুরদার নাম এইসব জানতেও চায় না কেউ। মানুষেৰ সেসব জানাব দরকাৰ হয়। তাই মানুষকে পুরোনো দিনের কথা জানতে হয়। পুরোনো দিনের কথাই ইতিহাসেৰ কথা। তাই ইতিহাসে বেশিৰভাগ মানুষেৰ কথাই থাকে। তবে তার সঙ্গে থাকে

১.৩ ইতিহাস আর ভূগোল

পবনদিন ক্লাসে দিদিমণি বললেন, ইতিহাস বুঝতে হলে ভূগোল জানতে হয়। একথায় সবাই তো অবাক। ওদের ভূগোল বই আর ইতিহাস বই আলাদা। আলাদা ক্লাস হয় তাহলে দিদিমণি এমনটা কেন বললেন? পৃথক সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, আসলে মানুষের কাজকর্মই তো ইতিহাসের বিষয়। আর মানুষের অনেক কাজই তার পরিবেশ ও ভূগোল দিয়ে ঠিক হয়। ধরো, নদীর পাশে যাবা থাকেন তাঁরা একভাবে বাঁচেন। তাঁদের রোজকার কাজকর্মে নদীর অনেক গুরুত্ব। আবার অনেকে মবুভূমি অঞ্চলে থাকেন। তাঁদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব কম। দেখবে মবুভূমির লোকেরা অনেকেই উটে চড়ে যাতায়াত করেন। আর নদীর কাছে যাঁরা থাকেন তাঁরা অনেকেই নৌকায় যাতায়াত করেন। এবারে দেখো, আমরা অনেকে নদী পেরোতে নৌকায় চড়ি। আবার বাজস্থানে উট আছে। সেখানে লোকে মবুভূমি পেরোতে উটে চড়েন। এটা অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যানবাহনের ইতিহাসে জানা যাবে নৌকার কথা। অন্যদিকে বাজস্থানের যানবাহনের ইতিহাসে থাকবে উটের কথা। এখন একেকটা জায়গায় যানবাহনের ইতিহাস আলাদা হলো কেন? কারণ, পরিবেশ ও ভূগোল আলাদা। আর তাই এক এক পরিবেশে, অঞ্চলে ইতিহাস এক এক রকম। খাবার, পোশাক, যানবাহন, ব্যবসাবাণিজ্য, কাজকর্মের নানান তফাত। খুব ছোটো জায়গা থেকে খুব বড়ো জায়গা সবখানেই এটা ঘটবে। ধরো, সমতল অঞ্চলের লোকেরা ভাত বেশি খান কেন? রাহুল বলল, সমতলে ধান চাষ বেশি হয়, তাই। দিদিমণি বললেন, ঠিক। পলাশ বলল, কিন্তু আমাদের কাকা বাজস্থানে থাকে। ওখানে ধান চাষ বেশি হয় না। কাকার বাড়িতে বুটাই বেশি খাওয়া হয়। দিদিমণি বললেন, এভাবেই মানুষের বেশিরভাগ কাজকর্ম তার পরিবেশ আর ভূগোলমুখিক চলে। তাই ইতিহাস বুঝতে গেলে সবসময় ভূগোলটাও জানা দরকার। মনে আছে ইতিহাসের গল্পের দুটো কথা ছিল কেন এবং কোথায়? সেই কেন এবং কোথায় জানার জন্যই পরিবেশ আর ভূগোল জানা দরকার।



টুকু কথো

আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাত্য

ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে ভাগ করেছে বিন্ধ্য পর্বত। সাধারণভাবে আর্যরা উত্তর অংশে বাস করত বলে ঐ অঞ্চলকে আর্যাবর্ত বলা হতো। আর্যাবর্তের সীমানা নানা সময়ে বদলেছে। একসময়ে আর্যাবর্ত বলতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতকেই বোঝানো হতো। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে আর্যদের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। এই দক্ষিণভাগকেই বলা হতো দক্ষিণাত্য। বিন্ধ্য পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা ছিল দক্ষিণাত্য অঞ্চল। দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল দক্ষিণাত্যে। কাবেবী নদীর দক্ষিণ অংশকে তাই দ্রাবিড় দেশও বলা হতো। দক্ষিণাত্য অঞ্চলের ভাষাগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা বলা হতো।

১.৪ পুরোনো দিনের হিসেব-নিকেশ

একদিন দিদিমণি বললেন, আজ আমরা পুরোনো দিনের হিসাব কবা শিখব। তোমাদের মনে আছে ইতিহাস শেখার প্রথম ধাপ কী? সবাই বলল, কবে - এই প্রশ্ন কবা। দিদিমণি বললেন, বলোতো, ভাবতে প্রথম যাত্রী নিয়ে ট্রেন কবে চলে? সবাই বলল, ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। দিদিমণি বললেন, বাঃ! বেশ মনে আছে তো! এবারে বলোতো, মানুষ কবে চাকা আবিষ্কার করেছে, কবে আগুন জ্বালাতে শিখেছে? এই প্রশ্ন দুটোই উত্তর ওবা জানে না। দিদিমণি বললেন, উত্তরগুলো তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। পারবে তো? সবাই বাজি। দিদিমণি বললেন, একটা সময় ছিল যখন ঘড়ি ছিল না। ক্যালেন্ডার ছিল না। মানুষ লিখতে পারত না। তাই কেউ সাল-তাবিখ দিয়ে লিখে বাখেনি কবে মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। অনেক অনেক পুরোনো দিনের হিসাব নিয়ে সেই জন্যই মুশকিল হয়। তবে কাজের সুবিধার জন্য নানা ভাগে ভাগ করতে হয় পুরোনো সময়কে। এই ভাগগুলোর হিসাব আলাদা আলাদা। ধরো, হাজার হাজার বছর মানুষ শুধু পাথরের ব্যবহার জানত। কিন্তু, ঠিক কবে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়, সে কথা কোথাও লেখা নেই। তাই ঐ হাজার হাজার বছরকে বোঝাতে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটা হলো যুগ। মোটামুটিভাবে অনেক লম্বা একটা সময় বোঝাতে যুগ কথাটা বলা হয়। আবার ধরো, হাজার-হাজার বছর এই পৃথিবীতে বরফ জমে ছিল। সেই লম্বা সময়কে বোঝাতে তুষার (বরফ) যুগ কথাটা বলা হয়। একসময়ে মানুষ তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এইসব ধাতুর ব্যবহার শিখল। সেই সময়টাকে বোঝাতে ধাতুর যুগ বলা হয়। কিন্তু ধাতুর যুগের মধ্যেও ভাগ আছে। যখন শুধু তামার ব্যবহার জানত, সেটা তামার যুগ। তেমনি পরে যখন লোহার ব্যবহার শিখল, তখন শুরু হলো লোহার যুগ। তবে লোহার যুগেও পাথর, তামা এসবের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল না। কিন্তু, লোহাই তখন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগল। লোহা যন্ত্রপাতি ব্যবহার কবেই মানুষ সহজে কাজ সারতে পারল। তাই ঐ সময়টার নাম হলো লোহার যুগ।

কিন্তু, ঠিক কবে কোন যুগ শেষ হলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। তাই সেসবের উত্তর দিতে গিয়ে একটা কথা জুড়ে দেওয়া হয় — আনুমানিক। তার মানে অনুমান বা আন্দাজ করে নেওয়া হয়েছে এমন। অনেক সময় পুরোনো দিনের সাল-তাবিখ আন্দাজ করে নিতে হয়। সময়ের হিসাবের সঙ্গে আনুমানিক কথাটা ব্যবহার করতে হয়।

টুকায় বর্ণনা

প্রাক-ইতিহাস, প্রায়-ইতিহাস, ইতিহাস

ইতিহাস কত পুরোনো দিনের কথা বলে? একসময় মানুষ লিখতে পারত না। সেই সময়ের কথা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই সময়কে অনেকে **প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ** বলেন। **প্রাক** মানে আগে। তাহলে **প্রাক-ইতিহাস** মানে ইতিহাসের আগের সময়। আবার একসময়ে মানুষ লিখতে শিখল। কিন্তু, সেই সময়ের পাওয়া সব লেখা আজও পড়া যায়নি। অর্থাৎ, পুরোনো সময়ের লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু পড়া যায় না। সেই পুরোনো সময়টাকে বলা হয় **প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ**। যে সময়ের লেখা পাওয়া যায় ও পড়া যায় তা হলো **ঐতিহাসিক যুগ**। তবে এই ভাগাভাগিগুলো নেহাতই কাজ চালানোর জন্য করা। ইতিহাস পুরোনো দিনের কথা বলে। সে যত পুরোনোই হোক। তখন মানুষ লিখতে পাবুক আর নাই পাবুক। সেসব লেখা পড়া যাক বা না যাক। পুরোনো দিনের কথাই ইতিহাসের কথা।

সাল-তারিখের নানারকম

মানুষ লিখতে শেখার পর থেকেই সহজ হলো পুরোনো দিনের কথা জানা। তাই কবে? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে লাগল অনেক সহজে। **আনুমানিক** কথাব দরকার কমে এল আস্তে আস্তে। সময়ের হিসাব করা সহজ হলো **সাল** কথাটা তোমরা জানো। **সাল** বোঝাতে **অব্দ** ও **বছর** কথাগুলোও ব্যবহার হয়। ইতিহাসে নানারকম অব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো বড়ো বা জবুরি ঘটনাকে ধরে অব্দ গোনা হতো। রাজাদের শাসন ধবেও অব্দ গোনা চালু ছিল। যেমন, **কনিষ্কাব্দ**, **গুপ্তাব্দ**, **হর্ষাব্দ** ইত্যাদি। কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে সেবা ছিলেন কনিষ্ক। তিনি সিংহাসনে বসে এক নতুন অব্দ গোনা চালু করেন। সেই অব্দ গণনাকে **কনিষ্কাব্দ** (কনিষ্ক + অব্দ) বলে। কনিষ্কাদের আর এক নাম **শকাব্দ**। ধরা হয় ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনে বসেন। তাহলে খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বাদ দিলে কত **শকাব্দ** তা জানা যাবে।

গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত একটা অব্দ গণনা চালু করেন, তাকে **গুপ্তাব্দ** বলা হয়। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ **গুপ্তাব্দ** গণনা শুরুর হয়। হর্ষবর্ধনও রাজা হওয়ার সময় (৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে **হর্ষাব্দ** গণনা চালু করেন।

১১১

ভেবে দেখো

একটি ক্যালেন্ডার নাও। সেটি ভালো করে দেখো। কোন বঙ্গাব্দ, কোন শকাব্দ এবং কোন খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডার সেটি?

সময় গোনার আর একটা হিসাবও দেখা যায়। সেটা হলো একসঙ্গে কয়েকটা বছর ধরে গোনো। ধরো, হাজার বছর একসঙ্গে হলে হয় সহস্রাব্দ (সহস্র (হাজার) + অব্দ)। আবার একশো বছর বোঝাতে শতাব্দ (শত (একশো) + অব্দ) কথাটা ব্যবহার হয়। শতাব্দকে শতাব্দী বা শতকও বলা হয়। দশ বছর একসঙ্গে বোঝাতে দশক কথাটা ব্যবহার হয়। তবে দশাব্দ বলা হয় না।

১.৫ বলা, আঁকা, লেখা

একদিন দিদিমণি ইতিহাস ক্লাসে একটা মজার কাজ দিলেন। বললেন, আমি কথা বলব না। হাত নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি কবব তোমরা সেটা দেখে বলবে আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। সবাই খুব মজা পেল। দিদিমণি হাত নেড়ে অনেক কিছু বোঝালেন। প্রথমে বুঝতে একটু অসুবিধা হলো সবাব। আস্তে আস্তে ওরা অনেকটাই ঠিকমতো বুঝতে পারল। দিদিমণি বললেন, এবারে আমি বোর্ডে ছবি আঁকে দেবো। ছবিগুলো দেখে বুঝতে হবে আমি কী বলতে চাইছি। প্রথমে কেউই বুঝতে পারল না। ছবিগুলোর মানে কী বেশ খানিকক্ষণ ভেবে পৃথা প্রথমে বলল। তারপরে বাকিরাও বুঝতে পারল। দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসের আবেকটা গল্প। একসময়ে মানুষ কথা বলতে পারত না। তখন হাত-মাথা নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি কবত। সেগুলো থেকেই একে অন্যের মনের ভাব বুঝত। তাবপরে তাবা শিখল ছবি আঁকতে। তখন ছবি আঁকে তাবা মনের কথা অন্যদের বোঝাত। সবাই মিলে যা কবত, তাব ছবি আঁকে বাখত। গৃহাব পাথরের দেয়ালে, মাটির গায়ে, ধাতুব পাতে। পবে একসময়ে ছবি আঁকে আঁকেই অক্ষর বোঝাত। ধবো, ক আব খ পাশাপাশি বসেছে হয়তো তাব মানে খিদে পেয়েছে। আবাব, ক আর গ পাশাপাশি বসল। তাহলে হয়তো ঘুম পেয়েছে বোঝানো হচ্ছে। এভাবেই ধীবে ধীবে মানুষ কথা বলতে, ছবি আঁকতে, লিখতে শিখেছিল। তবে এসব শিখতে হাজার-হাজার বছর সময় লেগেছিল। সেইসব ছবি, লেখাব কিছু কিছু আজও আছে। তাব থেকেই সেই সময়ের মানুষের কথা জানা যায়।

মাটির ওপরে ইতিহাস, মাটির নীচে ইতিহাস

রাহুল বলল, শুধু ছবি আর লেখা থেকেই কি ইতিহাস জানা যায়? পুরোনো দিনের কি অনেক লেখা পাওয়া যায়? দিদিমণি বললেন, না, অনেক লেখা পাওয়া যায় না। আবার যা লেখা পাওয়া যায়, তার সব পড়া যায় না। তাইতো পুরোনো দিনের সব কথা জানা যায় না। তবে ছবি আর লেখা ছাড়া আরো নানা কিছু থেকে ইতিহাস জানা যায়। যেমন ধবো, ঘরবাড়ি, বাসনপত্র, পোশাক

টুকরো কথা

জাদুঘর

জাদুঘর এই কথাটা তোমাদের অনেকেই জানা তবে সেই ঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না মাটির নীচে থেকে পাওয়া পুরোনো দিনের নানা প্রত্নবস্তু যত্ন করে রাখা থাকে। আর থাকে মাটির উপরে পাওয়া নানা জিনিসও। থাকে হাবিয়ে যাওয়া বিশাল জন্তুর হাড়। আবার থাকে রাজা-বানিদের পোশাক, অস্ত্র-শস্ত্র। নানাবকম মূর্তি, ছবি, বইপত্র আরও কত কী! পৃথিবীর নানা জায়গায় নানাধরনের জাদুঘর দেখা যায় ইংবাজিতে জাদুঘরকে বলে **Museum** (মিউজিয়াম)। কলকাতা শহরে একটা বিরাট জাদুঘর আছে

আবাব মুদ্রা, গয়না, অস্ত্র শস্ত্র, মূর্তি এমন নানা জিনিস থেকে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায় তবে এসব জিনিসও সবসময় পাওয়া যায় না ভেঙে গিয়ে বা মাটির নীচে চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যায় অনেক সময়ে। এইসব জিনিসগুলোই পুরোনো দিনের সাক্ষ্য। ধরো, ইতিহাস একটা শরীব। আর এই সবগুলো শরীরের হাড়। সেই টুকরো টুকরো হাড় জুড়ে ইতিহাসের কঙ্কাল তৈরি হয়। এগুলোকেই ইতিহাসের **উপাদান** বলে। মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া উপাদানগুলো খুঁজে বের করেন **প্রত্নতাত্ত্বিক** বা **পুরাতাত্ত্বিক**। **প্রত্ন** বা **পুরা** মানে পুরোনো **তাত্ত্বিক** মানে ধরো পণ্ডিত মানুষ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মানে পুরোনো মানুষ নয়।

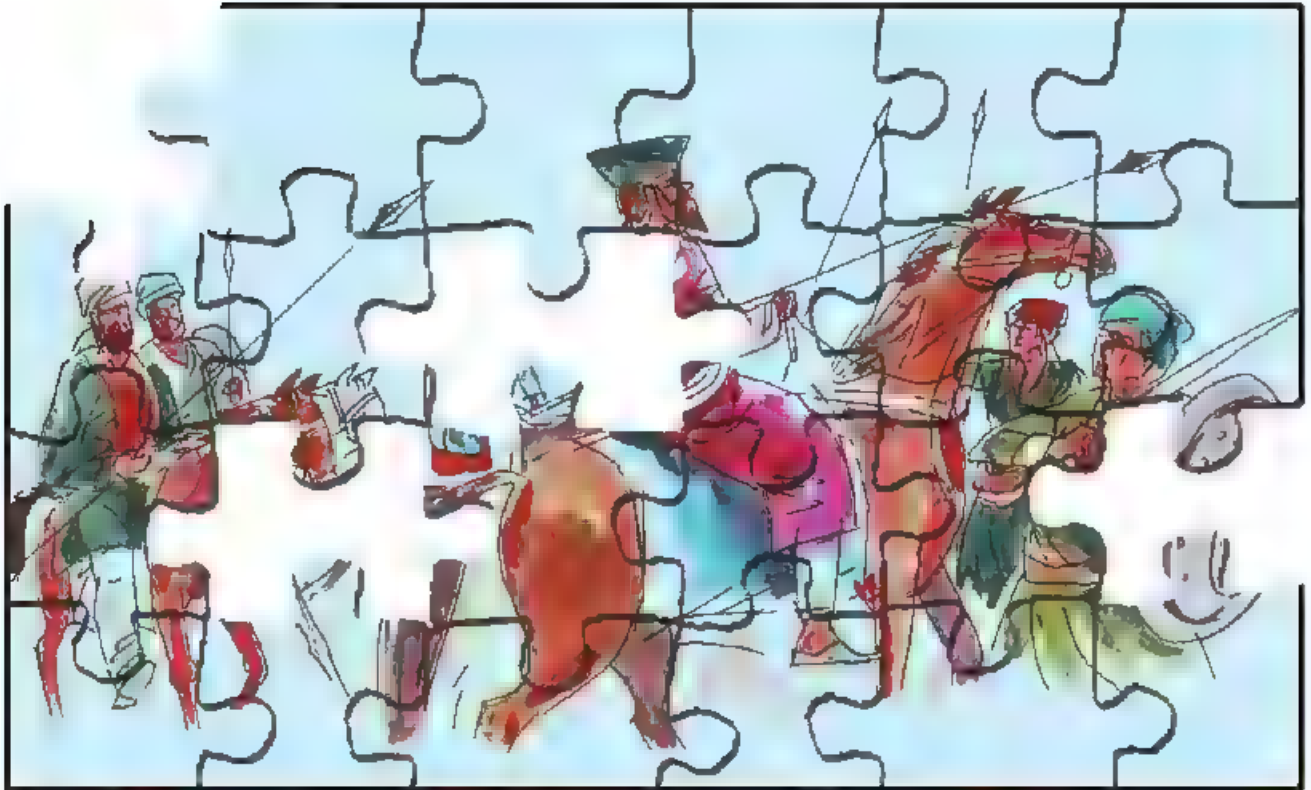
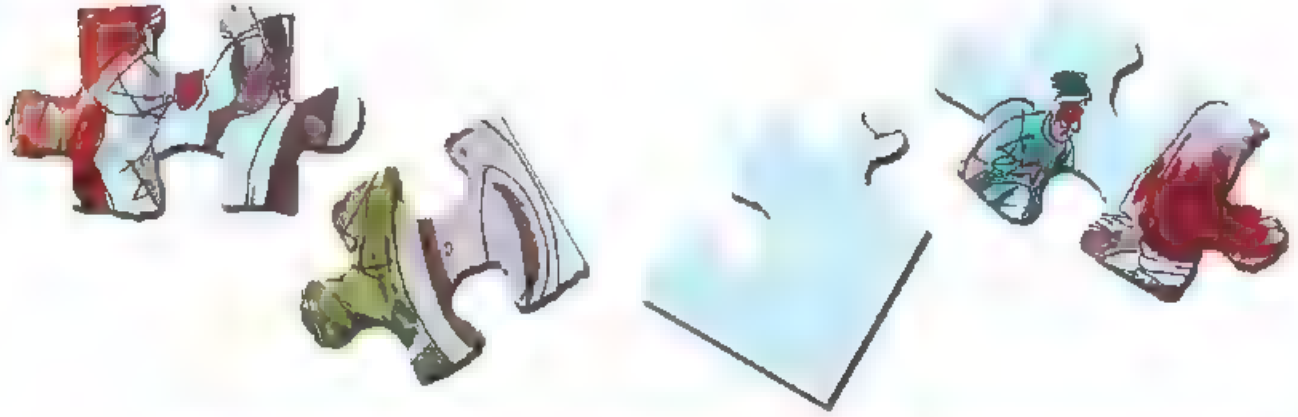
খুঁজে পাওয়া পুরোনো জিনিসগুলোকে বলে প্রত্নবস্তু বা পুরাবস্তু পুরোনো দিনের সেইসব জিনিস থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তবে সেগুলো অনেকটাই আন্দাজ। কারণ, সেই পুরোনো দিনগুলো আমরা চোখে দেখিনি। তাও পুরোনো দিনের লেখা পড়া গেলে সুবিধা হয়। কিন্তু যেসব লেখা পড়া যায় না? বা যে সময়ের লেখাই পাওয়া যায় না? সেইসব পুরোনো দিনের কথা জানতে মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসগুলোই কাজে লাগে। এভাবে মাটির উপরে ও নীচে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের নানা রকম উপাদান। সেই টুকরো টুকরো উপাদান খুঁজে জুড়ে নেন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তাব থেকে পুরোনো দিনের কথা জানতে পাওয়া যায়।

১.৬ টুকরোগুলো জুড়তে জুড়তে

স্কুলের শেষে বিকালে সবাই বুবিদের বাড়িতে গেল। দাদু আজ একটা মজার খেলা দেখালেন ওদের। কতগুলো টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে একটা ছবি। খেলাটার নাম **জিগ-স পাজল**। দাদু বললেন, ইতিহাসও এই খেলার মতো। টুকরো টুকরো উপাদান জুড়ে জুড়ে পুরো ছবিটা বানাতে হয়। যেখানে টুকরো পাওয়া যায় না বা হাবিয়ে যায়, সেখানে ফাঁক থাকে।

পরদিন দিদিমণিকে ওরা বলল জিগ-স পাজলের কথা। দিদিমণি বললেন, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেবা এইভাবেই পুরোনো দিনের ছবিটা সাজান। সব টুকরোগুলো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়, ভাবতে হয়। তাইতো পুরোনো দিনের কথা জানার এত মজা। ঠিক যেন এই জিগ-স পাজল খেলাটার মতো। এই বছরে তোমরা অনেক ওরকম **পাজল** নিজেরাই বানাতে পারো। সেই আদিম মানুষের কথা থেকে শুবু হবে তোমাদের জানা। তাবপব ভাবতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের হাজার হাজার বছরের কথা তোমরা জানবে আদিম

মানুষ ততদিনে সভা মানুষ হয়ে গেছে। তার মধ্যে বদলে গেছে কতকিছু। সেইসব বদলে যাওয়ার কথা তোমরা জানবে। দেখবে কেমনভাবে টুকরো জোড়া দিয়ে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায়। এবাবে তাহলে টুকরোগুলো খোঁজার ও জোড়ার কাজ শুরু হোক এই পুরো ইতিহাস বইটাই তো যেন বিরাট একটা জিগ-স পাজল!



পড়ার মাঝে মজার কাজ

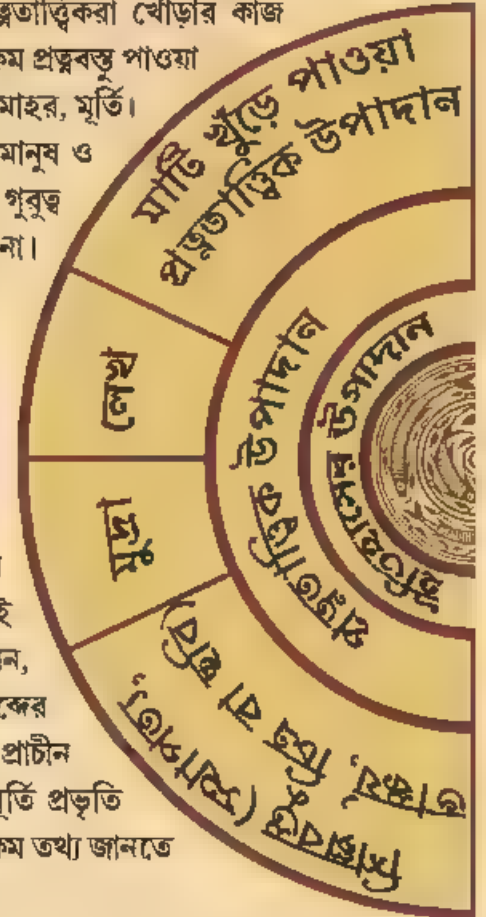
একটা পিচবোর্ড নিয়ে তাব উপরে সাদা কাগজ লাগাও। কাগজের উপরে নিজেদের পছন্দমতো একটা ছবি আঁকো। অসমান কয়েকটা টুকরো করে কেটে ফেলো ছবিটা। তারপর সবাই মিলে টুকরোগুলো সাজিয়ে গোটা ছবিটা বানাও। হয়ে গেলো তোমাদের জিগ স পাজল!

পুরোনো দিনের কথা গুছিয়ে লেখা থাকলে সহজেই জানা যেত পুরোনো সময়ের কথা। কিন্তু, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা ছিল না। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা নানাভাবে সেই ইতিহাস জানার চেষ্টাই করবেন। হবেক উপাদানের টুকরো জুড়ে জুড়ে একটা গোটা ছবি তৈরি করবেন। তবুও

পুরোনো দিনের সব লেখা আজও পড়ে ওঠা যায়নি। তাই ঐ লেখাগুলো থেকে পুরোনো সময়ের ইতিহাস জানা যায় না। যেমন, হরপ্পার লিপি আজও পড়া যায়নি। মাটি খুঁড়ে পাওয়া নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানই হরপ্পার ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। একটা বড়ো অঞ্চল জুড়ে অনেক সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁড়ার কাজ চালান। ওই অঞ্চলটাকে প্রত্নক্ষেত্র বলা হয়। তেমনি প্রত্নক্ষেত্র থেকে নানারকম প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। কখনও ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরের চিহ্ন। কখনও বা নানা পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি। আবার মাটির পাত্রের গায়ে লেগে থাকা শস্যের দানা বা খোসা। কখনও মানুষ ও পশুর হাড়গোড়, কঙ্কাল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে প্রত্নবস্তুগুলির গুরুত্ব বিরাট। তবে লিখিত ইতিহাস পাওয়া গেলেই প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা থেকে যাচাই করা যায় লেখা ইতিহাস কতটা ঠিক।

প্রত্নবস্তুর পরেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লেখমালা। প্রাচীনকালে পাথর বা ধাতুর পাত্রে লিপি খোদাই করে লেখা হতো। সেই লেখাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। পাথরের গায়ে খোদাই লেখাগুলিকে শিলা (পাথর) লেখ বলা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখগুলি লেখমালার শ্রেষ্ঠ নমুনা। আবার অনেক শাসকের গুণগানও লেখ হিসাবে খোদাই করা হতো। সেগুলোকে বলে প্রশস্তি। প্রশস্তি মানে গুণগান করা। এই প্রশস্তি লেখগুলি থেকেও ঐ শাসকের বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন, গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি। আর লেখমালাগুলিতে নানা অঙ্কের ব্যবহার দেখা যায়। তার থেকে ইতিহাসের ‘কবে’-র অনেক কিছু জানা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য মুদ্রা কাজে লাগে। মুদ্রায় শাসকের নাম, মূর্তি প্রভৃতি খোদাই করা থাকে। অঙ্কও পাওয়া যায় মুদ্রায়। এর ফলে মুদ্রা থেকে নানারকম তথ্য জানতে পারা যায়। শক-কুম্ভারদের ইতিহাস তো তাদের মুদ্রা থেকেই জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের নানা শিল্পবস্তু থেকেও ইতিহাসের নানা কিছু জানা যায়। এই শিল্পবস্তু সাধারণভাবে তিনরকমের। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। পাথর, ধাতু ও পোড়ামাটির উপরে খোদাই করে নানা কিছু বানানো হতো। যেমন দেব-দেবী, মানুষ ও পশুর মূর্তি। এগুলোই ভাস্কর্য। মন্দির বা প্রাসাদের দেয়ালেও ভাস্কর্য খোদাই থেকে অনেক বিষয় জানা যায়। তবে প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের নমুনা যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ভীমবেটকা ও অজন্তার মতো গুহার দেয়ালগুলোতে আঁকা ছবিগুলি যদিও আজও রয়েছে। সেখানে ছবির বিষয় হিসাবে শাসক ও সাধারণ মানুষের জীবনের নানাদিক ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সমাজ ও জীবন বোঝবার জন্য সেগুলি খুব জরুরি। আবার স্থাপত্যের নানা নমুনা থেকেও পুরোনো দিনের কথা জানা যায়। বাড়িঘর, প্রাসাদ, মন্দির এসবই স্থাপত্যের উদাহরণ।



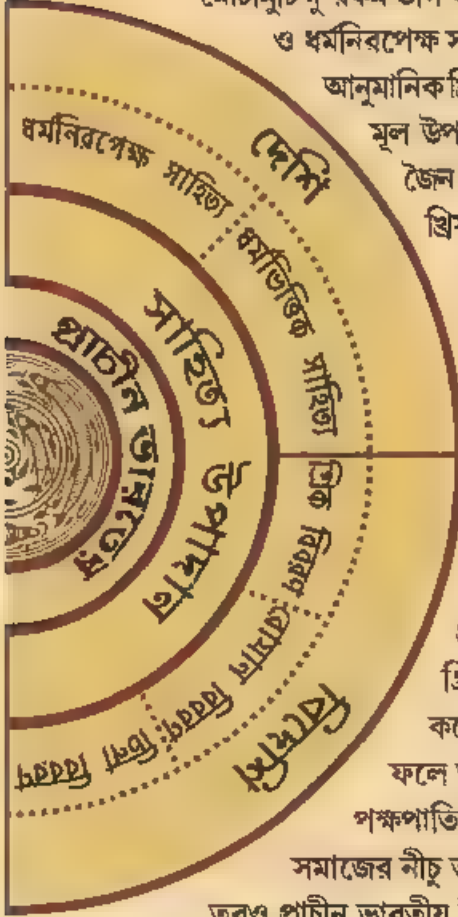
ইতিহাসের উপাদান

সবসময় ছবিগুলো পুরোপুরি তৈরি হয় না। কারণ উপাদানে ফাঁক থেকে যায় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মূল ছ-টি ভাগে ভাগ করা যায়। তার প্রতিটিব মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে। নীচের তালিকা-চাকাটি খেয়াল করো

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ক্ষেত্রে অনুমানের উপরে অনেকটা নির্ভর করতে হয়। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোটা অনুমান করতে হয় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অনেককম সাহিত্য উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলোকে মোটামুটি দু-রকম ভাগ করা যায়। দেশি ও বিদেশি লেখকদের রচনা। দেশীয় সাহিত্যকে আবার ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যে ভাগ করা যায়। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হলো বৈদিক সাহিত্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সময়ের ইতিহাস জানতে বৈদিক সাহিত্যগুলিই মূল উপাদান। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে মহাকাব্য ও পুরাণগুলির গুরুত্ব আছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের নানা লেখাতেও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা আছে। বিশেষত, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ইতিহাস জানার জন্য এই লেখাগুলি খুবই জরুরি।

ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নানা বই থেকেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। রাজনীতি, ব্যাকরণ, বিজ্ঞানের বইতেও সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির নানা কথা রয়েছে। পাশাপাশি কাব্য, নাটক, অভিধান, চিকিৎসাবিষয়ক বইতেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। বেশ কিছু জীবনীমূলক লেখাপত্রও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। বাণভট্টের *হর্ষচরিত* এমন লেখার একটি প্রধান উদাহরণ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য তিনধরনের বিদেশি বিবরণ খুব জরুরি। গ্রিক, রোমান ও চীনা দূত ও পর্যটকদের বিবরণ। তবে, বিদেশি সাহিত্যগুলির কয়েকটি সমস্যা আছে: বিদেশিরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি বুঝতেন না। ফলে অনেক কিছুর মানে বুঝতে তাদের ভুল হয়েছিল। তাছাড়া অনেক লেখার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশীয় সাহিত্যেও পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ আছে। তাছাড়া, কাব্য-নাটকে সমাজের নীচ তলার মানুষের কথা বিশেষ জানা যায় না। অধিকাংশ সাহিত্যের বর্ণনা মনগড়া। তবুও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানার জন্য সাহিত্য উপাদানগুলোর গুরুত্ব রয়েছে



ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ

যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন

ফুল থেকে দল বেঁধে একদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়া হলো। সঙ্গে দিদিমণি ও মাস্টারমশায়বাও ছিলেন। শিম্পাঙ্কি দেখে তিতির বলে উঠল, জানিস মানুষ আগে শিম্পাঙ্কির মতোই ছিল! আনোয়ার বলল, শিম্পাঙ্কি তো জন্তু, গায়ে বড়ো বড়ো লোম। তাছাড়া শিম্পাঙ্কি ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারে না। সিধু বলল, চল, আমরা সবাই দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করি অরুণ বলল, দিদি, মানুষ কি সত্যি এক সময় শিম্পাঙ্কির মতো ছিল? দিদিমণি বললেন, আজ চিড়িয়াখানা ভালো করে ঘুরে দেখো। কাল ক্লাসে আমরা এবিষয়ে কথা বলব।



২.১ আদিম মানুষের কথা

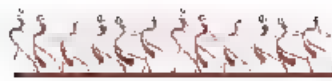
মানুষ ও তার কাজকর্ম নিয়েই মানুষের ইতিহাস। মানুষ আবার একটি বিশেষ প্রাণীও। শরীরের নির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য থেকেই আলাদা করে মানুষকে চেনা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানান বদলের মধ্যে দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি হয়েছে। দু-পায়ে হাঁটা, হাতের ব্যবহার, লম্বা মেবুদণ্ড— এই সবই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর তার মেবুদণ্ডের উপরে রয়েছে একটি বড়ো মস্তিষ্ক।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যাবা হাতের বুড়ো আঙুলকে কোনো কিছু ধরতে ব্যবহার করে। তাছাড়া মানুষের মাথার খুলি বড়ো মস্তিষ্ক ধরে রাখতে পারে। কয়েক লক্ষ বছর ধরে এইসব বদলগুলো মানুষের শরীরে হয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব অংশেও তেমনি ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বিশাল আকারের ভয়ানক সব প্রাণী। গাছে গাছে ছিল নানা ধরনের অনেক পাখি আর বানর। সেখানে এক ধরনের বড়ো বানর ছিল। তাদের লেজ ছিল না। এদের এপ (Ape) বলা হয়। অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে আবহাওয়া বদলাতে থাকল। নানা কারণে গাছপালা আগের থেকে কমে গেল। গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হয়ে গেল। তাছাড়া আগের মতো সহজে ফলমূল পাওয়াও মুশকিল হয়ে গেল। তখন এপদের একদল গভীর জঙ্গলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অন্য দলটি খাবার খুঁজতে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল। দু পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। খাবার সহজে পাওয়া গেল না। তাই খাবার খোঁজা শুরু হলো। এবপব এল কোনোভাবে দাঁড়াতে পারা মানুষ। সে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগের কথা। এইভাবে আস্তে আস্তে এপ থেকে আলাদা হয়ে গেল মানুষ পরিবার বা হোমিনিড। শুরু হলো মানুষের এগিয়ে চলা এবং নিজেকে উন্নত করা।





টুকরো কথা আদিম মানুষের নানারকম

আদিম কথার মানে খুব পুরোনো বা গোড়ার দিকের। খুব পুরোনো সময়ের মানুষ বোঝাতে আদিম মানুষ কথাটা ব্যবহার করা হয়। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে পুরোনো আদিম মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকাতে। আদিম মানুষের মধ্যেও নানারকম ভাগ রয়েছে। মূলত মস্তিষ্কের আকার থেকেই সেই ভাগাভাগি করা হয়।

অস্ট্রালোপিথেকাস : এপ থেকে মানুষ



- এরা ছিল আনুমানিক ৪০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে
- এরা দু পায়ে ভর দিয়ে কোনোক্রমে দাঁড়াতে পারত।
- শক্ত বাদাম, শুকনো ফল চিবিয়ে খেত। চোয়ালে ছিল শক্ত ও সুগঠিত
- এরা গাছে ডাল দিয়ে ধাক্কা মারত, পাথর ছুঁড়তে চেষ্টা করত



হোমো হাবিলিস : দক্ষ মানুষ



- এরা ছিল আনুমানিক ২৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে
- এরা দলবদ্ধভাবে থাকত। হাঁটতে পারত
- ফলমূলের পাশাপাশি এরা সম্ভবত কাঁচা মাংস খেত
- এরাই প্রথম পাথরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে একটা পাথর দিয়ে আবেকটা পাথরকে জোরে আঘাত করে পাথরের অস্ত্র বানাত।



হোমো ইরেকটাস : সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ



- এরা ছিল আনুমানিক ২০ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে।
- এরা দু-পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াত। দলবদ্ধভাবে গুহায় থাকত।
- এরা শিকার করতে পারত। এরাই প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।
- এরা বানিয়েছিল স্তরকাটা নুড়ি পাথরের হাতিয়ার, শেষ দিকে বানিয়েছিল হাতকুঠার।



হোমো স্যাপিয়েন্স : বুদ্ধিমান মানুষ



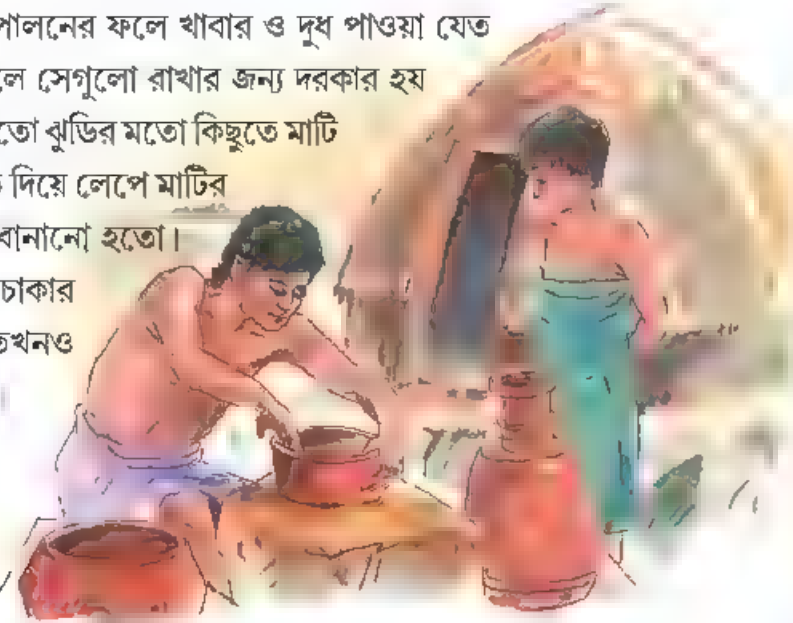
- এরা আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে এসেছিল।
- এরা দল বেঁধে বড়ো পশু শিকার করত। নানা কাজে আগুন ব্যবহার করত। পশুর মাংস পুড়িয়ে খেত। পশুর চামড়া পরত।
- ছোটো, তীক্ষ্ণ ও ধারালো পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল। এরা বর্ষা জাতীয় পাথরের অস্ত্র বানাতে পারত



আদিম মানুষ তখনও শিকারি ছিল। সরাই নহর বাইতে জাঁতার মতো যন্ত্র দেখা গেছে। শস্যদানা গুঁড়ো করতে ওই জাঁতা ব্যবহার হতো। তবে সবাই নহর বাইয়ের মানুষ বনের শস্য এনে জাঁতায় পিষে নিত। তারা কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত না। ঐ প্রত্যক্ষেত্রে আদিম মানুষের সমাধি ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। মহাদহাতেও সমাধি পাওয়া গেছে। সেখানের কঙ্কালগুলি থেকে জানা যায় কম বয়সেই সেই মানুষগুলি মারা গিয়েছিল।

নর্মদা উপত্যকার আদমগড়ে আট হাজার বছর পুরোনো বন্য পশুর হাড় পাওয়া গেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু গবাদি পশু ও কুকুরের হাড়ও রয়েছে। গবাদি পশু ও কুকুরের হাড়ে আঘাতের চিহ্ন নেই। অর্থাৎ তাদের মারা হয়নি। এর থেকে মনে হয় আদমগড়ের মানুষ পশুপালন করতে শিখেছিল। তবে তাবাও শিকার কবেই খাবার জোগাড় করত।

পশুপালনের ফলে খাবার ও দুধ পাওয়া যেত বেশি ফলে সেগুলো রাখার জন্য দরকার হয় পাত্র হয়তো ঝড়ির মতো কিছুতে মাটি ঢেলে হাত দিয়ে লেপে মাটির পাত্রগুলি বানানো হতো। কুমোরের চাকার ব্যবহার তখনও শুরু হয়নি।



২.২.৩ উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগ

আদিম মানুষের ইতিহাসে নতুন পাথরের যুগ অনেকদিক থেকেই নতুন ছিল। পাথরের হাতিয়ার বানানোর কৌশল অনেক উন্নত হয়েছিল। নানান রকম পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়। পাশাপাশি ছোটো পাথরের হাতিয়ারও এসময় ব্যবহার করা হতো। এই পর্যায়ে প্রথম আদিম মানুষ কৃষিকাজ শেখে ফলে তারা নিজেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন শুরু করে নতুন পাথরের যুগে শিকার করতে বা পশু চরাতে ছেলেরা দল বেঁধে যেত। মেয়েবা বাচ্চাদের

টুকরো কথা

বাগোড়

রাজস্থানের বাগোড়ে আদিম মানুষের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে একেবারে প্রথমদিকে বাগোড়ের বাসিন্দারা শিকার কবেই খাবার জোঁতাৎ কিছু কিছু পশুপালনও তাদের জানা ছিল। বাগোড়ে অনেকগুলি পশুর হাড় পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে অনুমান করা হয় পর্বের দিকে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়েছিল। পাশাপাশি কমতে থাকে শিকার করা পশুর সংখ্যা। অর্থাৎ বাগোড়ের মানুষ ধীরে ধীরে গৃহপালিত পশুর গুবুড় বুঝতে পেরেছিল। সেভাবে দেখলে বাগোড়ে শিকার ও পশুপালন দুই-ই চলত।



ছবি ২৪

বিভিন্ন পাথরের যুগে
আদিম মানুষের হাতিয়ার

দেখাশোনা কবত ফলমূল জোগাড় কবত। এইভাবে একসময়ে গাছপালা দেখতে দেখতে মেয়েবা বুঝতে পাবল কীভাবে বীজ থেকে চারাগাছ হয়, চাচাগাছ থেকে বড়োগাছ। তখন শুধু খাবার খোঁজা নয়, খাবার তৈরি কবতে পাবল তাবা। মানুষ শিখল কৃষিকাজ। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে কৃষি অঞ্চলেই স্থায়ী বসতি বানিয়ে থাকতে শুরু করে মানুষ। চাষের সঙ্গে যুক্ত হয় বাস বা থাকা। চাষবাস কথাটা আজও ব্যবহার হয়। তার থেকে ক্ষেতের পাশে বসতি বানানোর গুরুত্ব বোঝা যায়। শিকার ও পশুপালনের জন্য মানুষকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। কৃষিকাজ শুরু করার পরে সেই ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়। তাছাড়া কৃষিকাজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। শিকারের মতো তা অনিশ্চিত নয়। ফলে যাযাবর মানুষ ধীরে ধীরে কৃষি ও স্থায়ী বসতির দিকে যেতে থাকে। চাষ করার ফলে পশুপালনও সহজ হয়ে গেল। অটেল খড়, বিচালি গবাদি পশুর সংখ্যা বেড়ে গেল।

শিকার ও পশুপালন করে যা পাওয়া যেত, তা গোষ্ঠীর সবাই ভাগ করে নিত। তাই সেই সমাজে ভেদাভেদ বিশেষ ছিল না। তুলনায় কৃষি সমাজ অনেক বেশি জটিল। সেই সমাজে জমি ও ফসলের সমান ভাগাভাগি ছিল না। পাশাপাশি কৃষিতে বাড়তি ফসল ফলানো যেত। তাই সবাইকে নিজেদের পেট ভরানোর জন্য নিজেদের চাষ কবতে হতো না। ফলে কৃষির বদলে অনেকেই কাবিগব বা অন্যান্য কাজ করতে থাকে। চাষের কাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো। পাথর ও কাঠ দিয়ে সেগুলো বানাত কাবিগবেরা ফলে ক্রমশ আদিম মানুষের সমাজ থেকে জটিল ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা দেখা দেয়।

এবারে ভেবে দেখো মানুষের চেয়ে অনেক প্রাণীর শক্তি অনেক বেশি। অথচ সেই শক্তিশালী প্রাণীরা অনেকেই একসময়ে হাবিয়ে গেছে। তোমরা তো ডাইনোসোরের কথা জেনেছ। কিন্তু মানুষ আজও টিকে আছে। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ উন্নতিও করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই টিকে থাকা ও উন্নতি কবা সম্ভব হলো কীভাবে? তার জন্য অনেকটা দায়ী মানুষের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে এমনিতে নাচ গান, পোশাক, শিল্প সাহিত্য বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতি কথাটির



২২২

ভেবে দেখো

পুরোনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রায় কোন কোন বিষয়গুলি জবুরি হয়ে উঠেছিল? তার একটা ছবিসহ তালিকা বানাও।



ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ১.১) আদিম মানুষ প্রথমে — (বাগা করা খাবার/পোড়া মাংস/কাঁচা মাংস ও ফলমূল) খেত
১.২) আদিম মানুষের প্রথম হাতিয়ার ছিল — (ভোঁতা পাথর/ হালকা ছুঁচালো পাথর/ পাথরের কুঠাব)।
১.৩) আদিম মানুষের জীবনে প্রথম জরুরি আবিষ্কার — (ধাতু/ চাকা/ আগুন)

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

কৃষিকাজ	মধ্যপ্রদেশ
পশুপালন	নতুন পাথরের যুগ
ভীমবেটকা	মাকের পাথরের যুগে
হুঙ্গি	কর্ণাটক

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৩.১) আদিম মানুষ যাযাবর ছিল কেন?
৩.২) আগুনে জ্বালাতে শেখার পর আদিম মানুষের কী কী সুবিধা হয়েছিল?
৩.৩) আদিম মানুষ কেন জোট বেঁধেছিল? এর ফলে তার কী লাভ হয়েছিল?

৪। হাতেকলমে করো :



৪.১) পাশের ছবিটিতে মানুষের প্রতিটি ধাপের মধ্যে কী কী বদল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?



৪.২) পাশের ছবিদুটি থেকে আদিম মানুষের পাথরের হাতিয়ার বানানোর পদ্ধতি বিষয়ে কী জানা যাচ্ছে?

৩

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ

ইতিহাসে কি তাহলে শুধু পাথরের কথাই থাকে? বিনিব একদম ভালো লাগে না। খালি নানাবকম পাথরের হাতিয়ারের কথা। বুবির দাদু একদিন বললেন, পাথর নিয়ে এত চিন্তা কীসের? পাথরবেওতো লেখা থাকে ইতিহাসের কথাই। তবে পাথরে ইতিহাসই সব নয়। তাব সঙ্গে মিশে আছে মানুষের জীবনও। সবাই এবাবে জমিয়ে বসল। দাদু আবাব ইতিহাসের গল্প শুরু করলেন।

খাবারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ একসময় স্থায়ীভাবে বাস করতে শিখল নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে শিখল। শুরু করল কৃষিকাজ। তার পাশাপাশি পশুপালনও করতে লাগল। পাথরের যুগের শেষদিকে স্থায়ী বসতবাড়ি, কৃষিকাজ এবং পশুপালনকে ঘিবেই গড়ে উঠেছিল মানুষের জীবনযাত্রা। এভাবেই কালে কালে বদলে গেল মানুষের জীবনযাপনের নানা দিক



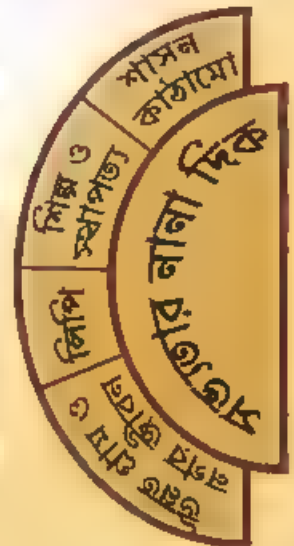
অবশ্য সেই বদল ঘটেছে মানুষের নিজের প্রয়োজনেই। নিজের বৃদ্ধি আর পরিশ্রমের জোরে সেই বদল ঘটিয়েছে মানুষ। সেভাবেই একসময় আদিম মানুষ হয়ে উঠেছে সভ্য। তবে আদিম থেকে সভ্য হওয়ার পথে মানুষকে অনেক ধাপ পেরোতে হয়েছে। যেমন, নতুন পাথরের যুগে চাষের কাজে ব্যস্ত মানুষের দরকার হলো স্থায়ী বসতবাড়ি ও চাষের জমি। সেই সময় চাষের জমির পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে জমির চাহিদা। যে যার মতো জঙ্গল সাফ করে চাষের জমি বার করে নিতে থাকে। যার যত জমি তার তত ফসল। এভাবেই শুবু হলো জমির জন্য লড়াই। জোট বেঁধে বাস কবতে থাকা মানুষদের নিজেদের মধ্যে একসময় মতের অমিল দেখা দিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিয়ে তো চলা যায় না। তাই তারা নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নিল। ঠিক হলো সবাই নিয়ম মেনে চলবে। এভাবেই সেসময় চালু হলো নিয়ম বা নিয়মের শাসন।

আগুন্তে আগুন্তে সভ্য মানুষের নানা জিনিসের চাহিদা বাড়ল। তাছাড়া প্রয়োজনমতো সব জিনিস কোনো একজন মানুষ তৈরি কবতে পারে না। তাই প্রথমে শুবু হলো জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়া। এবপর্ব এল সেকালের মুদ্রা। তার ফলে জিনিস কেনাবেচা করা সহজে হলো।

সেই পাথরের যুগ থেকে মানুষ জোট বাঁধতে শুবু করেছিল। পরে তৈরি করল সমাজ। সমাজে মানুষ নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেখানে কাজের বিচারে তৈরি হলো মানুষের নানা ভাগ। একসময় মানুষ লিখতে শিখল। আর তাব প্রয়োজনে এল বর্ণ বা লিপি। সেসময় মানুষ কেবল গ্রামেই নয়, নগরেও বাস কবত। এভাবেই গ্রাম ও নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সভ্যতা। আদিম মানুষের যুগ থেকে ইতিহাস এসে পড়ল সভ্যতার যুগে।

পবদিন ক্লাসে সবাই বুঝি দাদুর গল্প করল। দিদিমণি শুনলেন। তাবপরে বললেন, সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা খানিকটা আলাদা। সব মানুষেরই কোনো না কোনো সংস্কৃতি থাকে। তা তোমরা আগেই জেনেছ। কিন্তু, সভ্যতাব কথা এলে বিষয়টা আর একটু আলাদা হয়ে যায়। সভ্যতাব কতগুলো দিক থাকে। সেইসব দিক মিলিয়ে তৈরি হয় একটা সভ্যতা। এবাবে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছবি আঁকলেন। সবাই মন দিয়ে সেটা দেখল।

দিদিমণি বললেন, মানুষ নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে শিখল। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসও শুবু করল। কিন্তু সভ্যতা হতে গেলে সেইসঙ্গে আরও কতগুলো বিষয়ও থাকতে হবে। গ্রাম ও নগর থাকতে হবে। শাসনব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প ও স্থাপত্যের নমুনা সভ্যতার একটা বড়ো দিক। আর অবশ্যই লিপির ব্যবহার জানতে হবে সভ্য মানুষকে। লিপিমালার ব্যবহারই সভ্যতার সবথেকে বড়ো মাপকাঠি। সভ্যতা বলতে একদিকে জীবনযাপনের উন্নতি বোঝানো হয়। ধরো, যখন লিখতে শিখল মানুষ বা গুহার বদলে বানাতে শিখল পাকা বাড়ি। আবার পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল।





মনে রেখো

নতুন পাথরের যুগের
শেষের দিকে চাকার
ব্যবহার শুরু হয়।

এইসবই এক একটা উন্নতির চিহ্ন। এগুলো সবই সভ্যতার নানা দিক। আর এক একটা ভৌগোলিক অঞ্চলকে ঘিবে একেকটা সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা এসব নামকরণ হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে নগর সভ্যতা গড়ে উঠল। আদিম গোষ্ঠী সমাজে সবাব মধ্যে একটা সমতার ধারণা ছিল। নগর সভ্যতায় সেই সমতা আর থাকল না। শাসক গোষ্ঠী তৈরি হলো। যাবা গোটা জনসমাজকে শাসন করত। আবার একদল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞ কবত। এভাবেই সমাজে নানারকম ভেদাভেদ তৈরি হলো। এটাও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য।

আদিম গোষ্ঠী সমাজে রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে জোট বাঁধত মানুষ। অন্যদিকে সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো একে অন্যের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধার সম্পর্কে জোট বাঁধা। যেমন হরপ্পা সভ্যতার কথাই ধরা যাক। যে ব্যক্তি পুঁতি বানাত তার ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি দবকার হতো। ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি বানাত ব্রোঞ্জের কারিগর। আবার পাথর গবম করা জন্য দবকার হতো পাত্র। সেই পাত্র তৈরি কবত কুমোব। এভাবেই পুঁতি বানানোব কারিগরকে ব্রোঞ্জের কারিগর এবং কুমোরের উপবে নির্ভর কবতে হতো। এই পাবম্পবিক নির্ভর করাটাই সভ্যতার বড়ো বৈশিষ্ট্য।

আবার গ্রাম ও নগরের পাশাপাশি টিকে থাকাও সভ্যতার জন্য জরুরি। নগরের বাসিন্দাবা গ্রামের ফসলের উপবেই নির্ভর কবে থাকত। এভাবেই নগর ও গ্রামকে ভিত্তি কবে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল হরপ্পা সভ্যতা। তবে কোনো সভ্যতাই হঠাৎ গড়ে ওঠে না। তার পিছনেও থাকে ইতিহাস। এবারে আমবা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতার কথা জানব।

৩.২ মেহেরগড়

নতুন পাথরের যুগের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগে মানুষের জীবনযাপনে কতগুলি নতুন বিষয় যোগ হয়েছিল। একদিকে শুরু হয়েছিল কৃষিকাজ। অন্যদিকে পাথরের পাশাপাশি ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অবশ্য ধাতু বলতে তখন শুধু তামা ও কাঁসার ব্যবহারই বোঝাত। লোহার ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। তামা ও পাথর দুটোবই ব্যবহার হতো বলে এই সময়কে তামা পাথরের যুগ বলা হয়।

এখনকার পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মেহেরগড়ে তামা-পাথরের যুগের একটি প্রত্নকেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। মেহেরগড় বোলান গিরিপথের থেকে



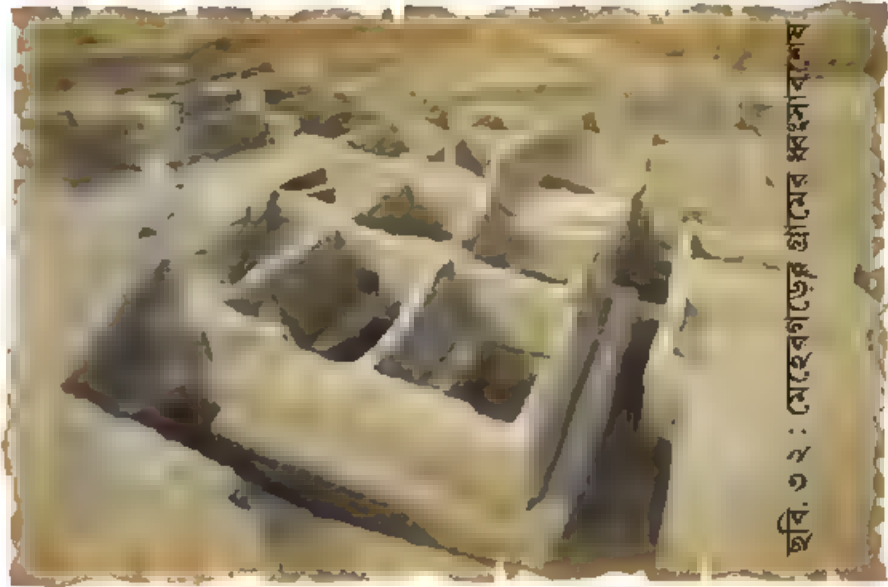
ছবি ৩.১ : মেহেরগড়ে
পাওয়া নারীমূর্তি

টুকরো কথা

মেহেরগড়ের সমাধি

মেহেরগড় সভ্যতাব
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো
সমাধিক্ষেত্র। সমাধিতে
মৃতদেহ সোজাসুজি বা
কাত করে শুইয়ে দেওয়া
হতো। মৃতের সঙ্গে
দেওয়া হতো নানা
জিনিসপত্র যেমন-
শাঁখ বা পাথরের গয়না,
কুড়ুল প্রভৃতি এছাড়া
সমাধিতে দেওয়া হতো
নানা গৃহপালিত পশুও
সমাধিতে মূল্যবান
পাথরও পাওয়া গেছে
মৃতদেহকে লাল কাপড়
জড়িয়ে, লাল রং
মাখিয়ে সমাধি দেওয়া
হতো।

বার করা সহজ ছিল না। ফলে পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহারও জারি ছিল।
এই সময়ে মেহেরগড়ে সিলমোহরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রামীণ
কৃষিসমাজ আরও জটিল রূপ নিচ্ছিল মেহেরগড়ে সেই বদলের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া
যায়। সেই বদলের চিহ্নগুলো আবও স্পষ্ট হয়ে উঠল হরপ্পা সভ্যতায়



ছবি ৩.২ : মেহেরগড়ের গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

মানচিত্র ৩.১ : ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগের গ্রামীণ বসতির প্রথম ধাপ
(উত্তর-পশ্চিম ভাগ)



মানচিত্র ৩.১ : ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগের গ্রামীণ বসতির প্রথম ধাপ

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

হরপ্পা সভ্যতা কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল? সাধারণ ভাবে বলা যায় জম্মুব মাণ্ডা ভারতীয় উপমহাদেশে এই সভ্যতার উত্তর সীমা তবে তারও উত্তরে আফগানিস্তানের একটি প্রত্নক্ষেত্রেও হরপ্পা সভ্যতার অনেক লক্ষণ দেখা গেছে। দক্ষিণে গুজরাট ও কচ্ছ অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল তবে আবও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ অঞ্চলেও এই সভ্যতার ছাপ দেখা যায়। হরপ্পা সভ্যতার পশ্চিম সীমা বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। পূর্ব দিকে হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে আলমগিরপুর পর্যন্ত। এই অঞ্চলটা দিল্লির পূর্বদিকে প্রায় সাত লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হরপ্পা সভ্যতা।

মানচিত্র ৩.২ : হরপ্পা সভ্যতার কতগুলি কেন্দ্র



নগর পরিকল্পনা

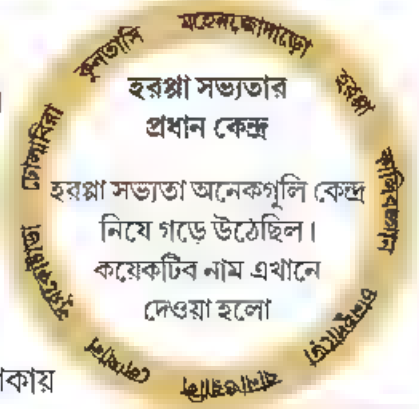
ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম নগর গড়ে উঠেছিল। তাই একে *প্রথম নগরায়ণ* বলা হয়। মহেনজোদাড়ো ও হবপ্পা ছিল সবচেয়ে বড়ো দুটো নগর। সে তুলনায় লোথাল ও কালিবঙ্গান ছিল ছোটো। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলোর ক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো তফাত ছিল। গুরুত্বের দিক থেকে সমস্ত নগর সমান ছিল না।

হরপ্পার নগরগুলিতে বসতি অঞ্চল দুটি স্পষ্ট ও আলাদা এলাকায় ভাগ করা ছিল। শহরে একটি উঁচু এলাকা থাকত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাকে বলেন *সিটাডেল*। এই এলাকাটি একটা বানানো টিবির ওপর অবস্থিত ছিল। সাধারণত টিবিটি আয়তাকার হতো। উঁচু এলাকায় বানানো হতো জরুরি ইমারত। সেগুলি সচরাচর সাধারণ মানুষের থাকার বাড়ি হতো না। নগরের প্রধান বসতি এলাকাটা নীচু অঞ্চলে থাকত। ঐ অঞ্চলে ইমারতগুলির মধ্যে বেশিভাগই বসত বাড়ি। উঁচু এলাকাটি প্রায়শই নগরের উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকত। নীচু বসতি এলাকাটা থাকত পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। একমাত্র চানহুদাড়োতে কোনো সিটাডেল ছিল না।

সিটাডেল এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। হরপ্পায় নগরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে দুটি ঢোকা ও বেবোনের ফটক ছিল। মহেনজোদাড়োতে উঁচু এলাকায় একটি বড়ো জলাধার ছিল। সেটি পাকা পোড়ানো ইটের তৈরি। বোধহয় স্নান করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। আয়তাকার জলাধারটিতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ির ধাপও ছিল। জলাধারটির কাছাকাছি কয়েকটি ছোটো ঘরও দেখা যায়। জলাধারটি সম্ভবত নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহার করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে খাদ্যশস্য মজুত রাখার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হবপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য দুটি বড়ো জায়গা ছিল। সেগুলি অনেকটা পাকা ইটের তৈরি বাড়ির মতো। হবপ্পায় শস্য রাখার বাড়িটির ভেতরে ছিল দুই সারিতে ভাগ করা মোট বারোটি বড়ো তাক। সেখানে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলিও ছিল। ফলে খাদ্যশস্য শুকনো ও তাজা রাখা সম্ভব হতো। তাছাড়া শস্য ঝাড়াই বাছাইয়ের ব্যবস্থাও ছিল। সেখানে দুই সারি ছোটো বাড়িও দেখা যায়। সম্ভবত ওখানে কাজ করত যারা তাবা ওই বাড়িতে থাকত।

মহেনজোদাড়োর উঁচু এলাকায় আরেকটি বিশাল ইমারত পাওয়া গেছে। মনে করা হয় সেটি সাধারণ থাকার বাড়ি নয়। এই ইমারতটি সম্ভবত বড়ো



???

ভেবে দেখো

এর আগে তোমরা পাথরের যুগের মানুষের ইতিহাস পড়েছ। তেমনি জেনেছ মেহেরগড়ের ইতিহাস। আর এখন জানছ হরপ্পা সভ্যতা। ভাবোতো কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে পাথর থেকে নানা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল?

১১১

ভেবে দেখো

হরপ্পা সভ্যতায় শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা কেন ছিল? আজও কি তোমরা শস্য, খাবার মজুত রাখার জায়গা দেখতে পাও?

টুকায়ো বখা

মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

স্নানাগার হলো স্নান করার জায়গা। এমনই একটি স্নানাগারের খোঁজ পাওয়া গেছে মহেনজোদাড়োতে। সেটি লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট। তাব চারি দিকে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেঁরা এবং মাঝামাঝি অংশে একটি বড়ো জলাশয় ছিল। জলাশয়টিতে বাইরের জল ঢোকা বন্ধ করা হয়েছিল। আবাব অতিরিক্ত জল বাব করে দেওয়াও যেত। জল পরিষ্কার করার ব্যবস্থাও ছিল।

ছবি ৩৩: মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

কোনো উৎসবে জমায়েত হওয়ার জন্য ব্যবহার হতো। ঢোলাবিবা নগরের সিটাডেল এলাকায় একটি জলাধারও দেখা যায়।

নগরের নীচু এলাকায় থাকত মূল বসতি। বাড়িগুলির নানারকম আকার দেখা যায়। মহেনজোদাড়োতে প্রায় ৩০০ বর্গ মিটার আয়তনের একটি বাড়ি পাওয়া গেছে। তাতে সাতাশটা ঘর ও একটি আঙিনা ছিল। আবেকটা বড়ো বাড়িতে উপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই বাড়িটির হয়তো অনেকগুলি তলা ছিল। এই ধরনের বড়ো বাড়িতে ধনী মানুষেরাই থাকতেন বলে মনে করা হয়।

বসত বাড়িগুলিতে বেশ কিছু ঘর থাকলেও বাম্বাঘর থাকত একটি মনে করা হয়। এই বাড়ির বাসিন্দাদের একটিই হেঁসেল ছিল। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় যৌথ পরিবার ছিল। ছোটো বাড়িগুলি দেখে মনে হয় সেগুলিতে গরিব মানুষেরা থাকতেন। এর থেকে হরপ্পার নগর জীবনে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শৌচাগার ও স্নানাগার। এর থেকে মনে হয় নগরগুলি সাধারণভাবে পরিষ্কার ছিল। মহেনজোদাড়োর নীচু এলাকায় প্রায় দু-হাজার বাড়ির জন্য অন্তত সাতাশটা কুয়ো ছিল। হরপ্পায় অত কুয়ো না থাকলেও, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার ছিল। পাকা নর্দমা দিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল। বড়ো নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। প্রতিটি বাড়ি থেকে ছোটো নালা গিয়ে মিশত বড়ো নর্দমাগুলোয়। উন্নত নগর শাসনের নমুনা ছিল এই জল নিকাশি ব্যবস্থা।





ছবি ৩৫:
হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া
গয়না, মাটির পাত্র ও
বাটখারা

হরপ্পা মানুষ জনত না। এছাড়াও ছিল ঘুরে বেড়ানো পশুপালক গোষ্ঠী। এইসব মিলিয়ে হরপ্পা সভ্যতার সমাজ গড়ে উঠেছিল।

মূর্তি গুলি দেখে হরপ্পার মানুষদের পোশাক, গয়না ও সাজগোজ সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। তাবা সূতি ও পশমেব বস্ত্র ব্যবহার করত। হরপ্পা সভ্যতাব নানা জায়গায় অনেক সোনা, বুপো, তামা ও হাতির দাঁতের গয়না পাওয়া গেছে।

কারিগরি শিল্প

হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতির অন্যতম জরুরি দিক ছিল কারিগরি শিল্প। পাথর ও ধাতু — দুটোরই ব্যবহার হতো কারিগরি শিল্পে। ধাতুর মধ্যে তামা, কাঁসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হতো। লোহার ব্যবহার হরপ্পার মানুষ জনত না। এই সভ্যতায় তামা ও কাঁসার তৈরি ছুরি, কুঠার, বাটালি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া মাটি ও ধাতুর বাসনপত্রও বানানো হতো। পাথরের ছবি তৈরির কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার নানাবকম মাটির পাত্র ছিল কারিগরির উন্নতির নজির। বেশিবভাগ পাত্র সাদামাটা, রোজকার ব্যবহারের জন্য। পোড়ানোর ফলে সেগুলি লালচে রঙের হয়ে উঠেছিল। কিছু পাত্রের গায়ে চকচকে লাল পালিশ লাগানো হতো। সেগুলির গায়ে উজ্জ্বল কালো রঙের নকশাও আঁকা হতো। এই পাত্রগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা **লাল-কালো মাটির পাত্র** বলেন। তুলনায় হালকা ও পাতলা এই মাটির পাত্রগুলি বোজগার কাজে ব্যবহার হতো না। মাটি দিয়ে থালা, বাটি, রান্নার বাসন, জালা জাতীয় পাত্র হরপ্পা সভ্যতায় তৈরি হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় কাপড় বোনার কারিগরিও ছিল। মহেনজোদাড়োতে পুবোনো কাপড় বানানোর নজির পাওয়া গেছে। কাপড়ে সুতোব কাজ করার শিল্পও হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। মহেনজোদাড়ো থেকে পাওয়া পুৰুষ মূর্তিটির গায়ের পোশাকে তারই নমুনা রয়েছে।

ইট বানানোর শিল্প এই সভ্যতাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি দিক। কাদামাটির ইট ও চুল্লিতে পোড়ানো পাকা ইট — দুয়েবই ব্যবহার দেখা যায়। তবে চুল্লিতে পোড়ানো পাকা ইট সম্ভবত জরুরি ইমাবত বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো।

হরপ্পা সভ্যতার কারিগরি শিল্পের অন্যতম নমুনা অনেকবকম মালার দানা। সেকাজে সোনা, তামা, শাঁখ, দামি-কমদামি পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির ব্যবহার হতো। নীলচে লাপিস লাজুলি পাথরও গয়না বানাতে লাগত। মালার দানা বানানোর কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। সূক্ষ্ম ওজন মাপার বাটখারারও খোঁজ মিলেছে।

শ্রোত ও হাওয়ার সাহায্যে সহজেই নৌকা চলতে পারত। কাজেই জলপথে যাতায়াত অনেক সম্ভা ছিল। মহেনজোদাড়োর সিলমোহরে নৌকার ছবি খোদাই করা আছে। পালতোলা নৌকার ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতায় ছিল। হরপ্পার অর্থনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত।

হরপ্পার ধর্ম

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক পোড়ামাটির নারীমূর্তি পেয়েছেন। তার থেকে মনে কবা হয় ঐ মূর্তিগুলির পূজো হতো। অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপূজার চল ছিল বলে মনে হয়। মহেনজোদাড়োতে একটি সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। সেটিতে এক যোগীব মূর্তি খোদাই করা আছে। ঐ যোগী জোড়াসনে বসে আছে। তার চাবপাশে রয়েছে গভার, বাঘ, হাতি ইত্যাদি বেশ কিছু বন্যপ্রাণী। একসময় ওই মূর্তিটিকে পশুপতি শিবের আদি রূপ বলে মনে কবা হতো। কিন্তু পশু শব্দে গৃহপালিত প্রাণী বোঝায়। অথচ ওই মূর্তির চাবপাশে সবই বন্যপ্রাণী দেখা যায়। সেকারণে ওই মূর্তিটাকে পশুপতি শিবের আদিরূপ মনে করার যুক্তি নেই।

হরপ্পার মানুষ নানাবকম জীবজন্তু ও গাছপালার পূজো করত। একশিংওলা কাল্পনিক পশুর মূর্তির পূজো খুব বেশি হতো। হরপ্পার সিলমোহরে ঘাঁড়ের ছাপ থেকে মনে হয় ঘাঁড়ের পূজোও হতো। কিন্তু সিলমোহরে কখনোই গোরুর মূর্তি দেখা যায় না। অশ্বখ গাছ ও পাতার ছবি সিলমোহর ও মাটির পাত্রে দেখা যায়। অশ্বখ গাছকে দেবতা হিসেবে পূজো করা হতো বলে মনে হয়। ধর্মীয় কাজে জলের ব্যবহার হতো। হয়তো মহেনজোদাড়োর জলাশয়টি ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হতো। মৃতদেহের মাথা উত্তর দিকে করে শুইয়ে রাখা হতো। সমাধির ভিতরে গয়না ও মাটির পাত্র রাখা হতো। কালিবঙ্গানে ইটের তৈরি সমাধিও দেখা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের পরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। অথচ হঠাৎ করে একটি সভ্যতা শেষও হয়ে যায় না। বেশ কিছু ঘটনার যোগফলে হরপ্পা সভ্যতার অবনতি হয়েছিল। মহেনজোদাড়ো নগরের বিরাট পাঁচিলটি বেশ কয়েকবার নষ্ট হয়েছিল। পাঁচিলটিতে একই



ছবি ৩.৯:

হরপ্পার দুটি সিলমোহর

???

ভেবে দেখো

হরপ্পার সিলমোহর দুটিতে
কোন কোন পশুর ছাপ
দেখতে পাচ্ছে?



ছবি ৩.১০:

হরপ্পার মাটির পাত্রের
টুকরো



ছবি ৩.১১:

হরপ্পার পোড়ামাটির হাতি



ছবি ৩.১২:

হরপ্পার সিলমোহরে
যোগীমূর্তি



ছবি ৩.১৩:

হরপ্পার সিলমোহরে
কাল্পনিক পশু

জায়গায় অনেকবার মেরামতির ছাপ দেখা যায়। তাছাড়া পাঁচিলের গায়ে কাদার চিহ্নও পাওয়া গেছে। ওই জমে থাকা কাদা সম্ভবত বন্যাব ফলে এসেছিল। সিন্ধুনদের বন্যায় মহেনজোদাড়োর ক্ষতি হয়েছিল বলে মনে হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ নাগাদ থেকে এশিয়া মহাদেশের অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। ফলে শূন্য জলবায়ু দেখা দেয়। তাব জন্য কৃষিকাজ সমস্যার মুখে পড়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার কৃষিব্যবস্থাও এই সমস্যার আওতায় পড়েছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া ইট পোড়ানোর জন্য চুল্লির জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার হতো। গাছ কেটেই ঐ কাঠ পাওয়া যেত বলে মনে হয়। ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়েছিল।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দের পবেব দিকে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। এর ফলে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি সমস্যায় পড়েছিল বলে মনে হয়। পাশাপাশি, নগর শাসন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এইসব সমস্যাগুলি থেকে বেরোবার পথ হরপ্পা সভ্যতার মানুষরা বের করতে পারেনি।

হরপ্পা সভ্যতার লিপি

হরপ্পার বাসিন্দারা লিখতে পারতেন। তাঁদের লিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, সেই লিপি আজ অবধি পড়া যায়নি। শুধু লিপির খানিকটা অনুমান করা যায়। হরপ্পার লিপি সাংকেতিক। তাতে ৩৭৫ থেকে ৪০০টার মতো চিহ্ন রয়েছে। তবে হরপ্পার লিপিতে বর্ণমালা সম্ভবত ছিল না। এই লিপি লেখা হতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। লিপিতে ছোটো চিহ্নগুলি হয়তো সংখ্যা বোঝায়। অনুমান করা হয় দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে হরপ্পার ভাষার মিল ছিল। ঋকবেদের ভাষাতেও দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাত্র, সিলমোহর, তামার ফলক নানা কিছুই হরপ্পার লিপি পাওয়া গেছে। লিপি সাজিয়ে সাইনবোর্ডের মতো জিনিস ঢোলাবিরা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার উন্নতির নমুনা এই লিপি। সেগুলি ঠিকমতো পড়া গেলে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক অজানা ইতিহাস জানা যাবে।

ছবি ৩.১৪:

হরপ্পার পোড়ামাটির গাড়ি



ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। যেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :

১.১) তামা, কাঁসা, পাথর, লোহা

১.২) ঘোড়া, হাতি, গভার, ঘাঁড়

১.৩) কালিবঙ্গান, মেহেবগড়, বানাওয়ালি, ঢোলাবিরা

২। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

২.১) লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য।

২.২) মেহেবগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি

২.৩) হরপ্পা সভ্যতা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা।

২.৪) হরপ্পার মানুষ লিখতে জানতেন।

৩। সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৩.১) হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘরগুলি তৈরি হতো — (পাথর দিয়ে/পোড়া ইট দিয়ে/কাঠ দিয়ে)।

৩.২) হরপ্পা সভ্যতা ছিল — (পাথরের যুগের/ লোহার যুগের/ তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের) সভ্যতা।

৩.৩) ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পাতেই — (প্রথম নগর / প্রথম গ্রাম/ দ্বিতীয় নগর) দেখা গিয়েছিল

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন / চার লাইন) :

৪.১) তোমার জানা কোনো একটি শহরের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার শহরের মিল-অমিলগুলি খুঁজে বার করো।

৪.২) সিন্ধুনদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি কেন গড়ে উঠেছিল বলে তোমার মনে হয়?

৪.৩) হরপ্পা সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর পাওয়া গেছে? সেগুলিতে কারা থাকতেন বলে মনে হয়?

৪.৪) তোমার কি মনে হয়, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হরপ্পার মানুষের থেকে কোন কোন বিষয় তুমি শিখবে?

৫। হাতেকলমে করো :

৫.১) হরপ্পা সভ্যতায় শহর ও মানুষের জীবন কেমন ছিল? তার ছবি দিয়ে চার্ট তৈরি করো।

৫.২) হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শনগুলি মাটি, পিচবোর্ড বা থার্মোকল দিয়ে বানাও। এই প্রত্ন-নিদর্শনগুলি হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে কীভাবে সাহায্য করে?

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ

ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে তানিয়ার মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হলো। বুঝির দাদুর কাছে একদিন ও জানতে চাইল সেগুলোর উত্তর আচ্ছা দাদু, বাক্স-বাক্সীবা কি সত্যিই ভয়ানক দেখতে হয়?



অরুণ বলল, মেলার মাঠে বাম বাবণের যুদ্ধ দেখেছি। বাবণ তো বাক্ষস রাজা তাই হারুকাকা বাবণ সাজার জন্য মুখে কালি মেখেছিলেন।

তিতির বলল, দাদু, রামায়ণের বাবণের সত্যিই দশটা মাথা ছিল?

দাদু সবসময় ওদের প্রশ্ন শুনে খুশিই হন। বললেন, মানুষের কল্পনায় আব কথায় এভাবেই গল্পগাথা তৈরি হয় বাক্ষসের যে বর্ণনা তোমরা জানো, সে সবই মানুষের কল্পনা রামায়ণের গল্পকথায় কিন্তু বাবণ খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। আব দশটা মাথা মানে দশ দিকে যাব মাথা খাটে।

পলাশ বলল, তাহলে বাবণকে কবে থেকে আব কেন ভয়ানক ভাবা শুরু হলো?

দাদু বললেন, এই তো ইতিহাসের কেন ও কবে তোমাদের ভাবাতে শুরু করেছে। রামায়ণ কী তা তোমরা সবাই জানো?

সুবাইয়া বলল, রামায়ণ তো বাম-বাবণের যুদ্ধের গল্প। আচ্ছা দাদু, রামায়ণ কি ইতিহাস?

দাদু বললেন, ইতিহাস সবতেই আছে। কোথায়, কতটা, কীভাবে ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেটা খোঁজাই ইতিহাসের গোয়েন্দার কাজ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলেছ বা দেখেছ। মোবাইল নিয়ে নিজের রাজ্য বা দেশের বাইরে গেলে বেশি টাকা কাটে কেন জানো?

অরুণ বলল, বাইরে ঘোরা বা বোমিং (Roaming)-এর জন্য।

দাদু বললেন, ইংবেজিতে **Roaming** শব্দটার একটা মানে হলো ঘোরা আবার সংস্কৃতে **রাম** শব্দের একটা অর্থ যিনি ঘুরে বেড়ান। খেয়াল করো ইংবেজি আব সংস্কৃত শব্দ দুটির অর্থের মধ্যব মিলটা। কোনো এক সময়ে একদল যাযাবর ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। সেখানকার পুবোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে শুরু হলো তাদের মেলামেশা আব সঙ্গে চলল যুদ্ধ-লড়াই। সেই যুদ্ধে বেশিরভাগ সময় বাইরে থেকে আসা মানুষগুলি জিতে গেল। তাবপব আস্তে আস্তে উপমহাদেশের উত্তর অংশে তারা বসতি তৈরি কবল। ধীবে ধীবে দক্ষিণ অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। মনে কবা হয়, দক্ষিণ অংশে ছড়িয়ে পড়ার সেই কাহিনিই রামায়ণে পাওয়া যায়।

যুদ্ধে জয় আব বসতি গড়ে তোলাব কথা ঘিরে তৈরি হলো অনেক গল্প। সেগুলি ফিবতে লাগল মুখে মুখে। সেই গল্পগুলোতে যুদ্ধে হেবে যাওয়া মানুষদের অন্যবকমভাবে দেখানো হলো। তাবা কখনও **রাক্ষস** বা **অসুর**, কখনও বা **দৈত্য**। তাছাড়া তারা কখনও **অসভা** বা **দস্যু**। রামায়ণ সেই যুদ্ধে জেতা মানুষদের গল্প তাই হেবে যাওয়া বাবণ সেখানে খাবাপ ও ভয়ানক

পরের দিন ইতিহাসের ক্লাসে দাদুর বলা কথাগুলো বলল তানিয়া। দিদিমণি বললেন, রামায়ণের ও মহাভারতের গল্পের আগের অনেক গল্পকথাও জানা যায়। সেইসব কথা আছে বেদ-এ। আজ আমরা সেই সময়ের কথাই জানব



৪.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবার

তোমরা *রা/ম* ও *Roaming* শব্দের মিল পেয়েছ অর্থে ও উচ্চারণে। এমনই আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন ধরো, বাংলায় *মা*, সংস্কৃতে *মাতঃ* বা *মাতৃ*, ইংরাজিতে *Mother*, লাতিন-এ *মাতের*। *পিতৃ* বা *ভ্রাতৃ* শব্দগুলোরও এমনই মিল রয়েছে বেশ কিছু ভাষার শব্দের সঙ্গে। উচ্চারণ ও অর্থের মিল কিন্তু এমনি এমনি হয় না। মানুষের পরিবারের মতো ভাষারও পরিবার আছে। সেই একই পরিবারের ভাষাগুলির মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকে। তেমনই একটা ভাষা পরিবার হলো *ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার*। ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপের অনেক ভাষাই এই ভাষা পরিবারের সদস্য। এদেরকে তাই একসঙ্গে *ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার* বলা হয়। এই ভাষা ব্যবহারকারীরা কোথায় থাকতো?

শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, তারা তৃণভূমি অঞ্চলের মানুষ ছিল। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দ বিশেষ ব্যবহার হয়নি। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে তারা মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের যাবার ছিল। তাদের নিজেদের ও তাদের পালিত পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ইরানে ও ভারতে।



ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের এক সদস্য ইন্দো ইরানীয় ভাষা। এই ভাষা মানুষের মুখে ধীরে ধীরে বদলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে মিশেছে নানান আঞ্চলিক শব্দ। সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষাগুলির মধ্যে একটি।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্তমানে আর নেই। ঋকবেদ ও জৈনদ্র অবন্তায় ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি সাহিত্যে ভাষায় ও বর্ণনায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। এর থেকে ইন্দো ইরানীয় ভাষার অন্তিত্ব জানা যায়। তবে মিলের পাশাপাশি এই দুই রচনায় বেশ কিছু অমিলও দেখা যায়। যেমন, ঋকবেদে যারা দেব, তাবা সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অবন্তায় যাবা দেব(দেব), তাদের ঘৃণা করা হতো। আবার অবন্তার শ্রেষ্ঠ দেবতা অহুর। অথচ বৈদিক সাহিত্যে অসুর (অহুর) খারাপ বলে পরিচিত। হয়তো কোনো কাবণে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল। তার ফলে এই গোষ্ঠীর একটি শাখা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিল। এদেরই ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী বলা হয়। এক্ষেত্রে মনে রেখো আর্য কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়। ইন্দো-আর্য ভাষারই সবথেকে পুরোনো সাহিত্য ঋকবেদ।

অনেকে অনুমান করেন উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ইন্দো-আর্য ভাষা ভারতে ঢুকেছিল। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই ইন্দো আর্যদের বসতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়। তাই এই সভ্যতাব নাম বৈদিক সভ্যতা।

৪.২ বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য

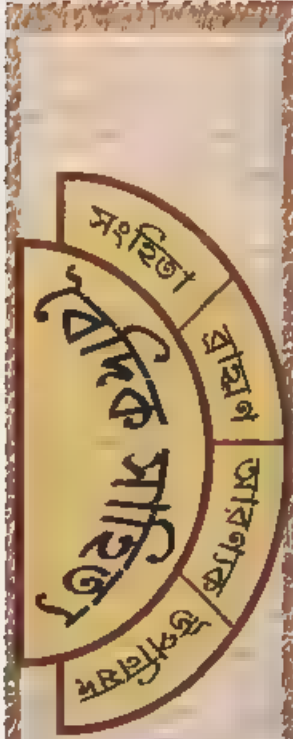
বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? বেদ এসেছে বিদ শব্দ থেকে। বিদ মানে জ্ঞান। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ করা যায়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারটি হলো সংহিতা। সংহিতাগুলি ছন্দে বাঁধা কবিতা। ঋকবেদ সবথেকে পুরোনো বৈদিক সংহিতা। ঋকবেদ রচনার ভাষা আর ভৌগোলিক পরিবেশের উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বাকি তিনটি সংহিতা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের পরের রচনা। তাই সেগুলিকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বলা হয়। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের দুটি ভাগ। আদি বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য থেকেই বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস জানা যায়। তাই বৈদিক যুগেরও ভাগ দুটি। আদি বৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ। আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান ঋকবেদ। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস জানা যায়।

১১১

ভেবে দেখো

১. তুমি কোন ভাষায় কথা বলো? সেই ভাষাটি কোন ভাষা পরিবার থেকে এসেছে বলে মনে হয়?

২. বলতে পারো ইন্দো-ইউরোপীয়রা তৃণভূমি অঞ্চলে কেন বাস করত?



- ❑ ঋকবেদের সূক্তগুলি ছন্দে বাঁধা ঋক-এর সমষ্টি। তাই ঐ সংহিতার নাম ঋক সংহিতা। সংহিতা কথার অর্থ সংকলন করা
- ❑ সামবেদ সংহিতাব বৈশিষ্ট্যগুণটি ঋকবেদের থেকেই নেওয়া কেবল সামবেদ সুর করে গানের মতো গাওয়া হতো।
- ❑ যজুর্বেদ মূলত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে দরকারি মন্ত্রের সংকলন মন্ত্রগুলি কিছুটা পদ্যে ও কিছুটা গদ্যে লেখা।
- ❑ অথর্ববেদ জাদুমন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে ও তার পরেও দীর্ঘদিন অথর্ববেদকে সংহিতা বলে ধরা হতো না।
- ❑ সংহিতাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি হয়েছিল গদ্যে লেখা ব্রাহ্মণ।
- ❑ আরণ্যকগুলি যারা লিখতেন তারা অবশ্যে (বনে) থাকতেন যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা ও নানা চিন্তাভাবনা আরণ্যক সাহিত্যে দেখা যায়।
- ❑ বেদ-এর নানা তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও চিন্তাভাবনা উপনিষদে আছে।
- ❑ বৈদিক সাহিত্যগুলিকে ঠিক মতো উচ্চারণ করা, ছন্দ, আসল অর্থ বোঝার জন্য রচনা হয়েছিল বেদাঙ্গ। সংখ্যায় বেদাঙ্গ ছ-টি এছাড়াও নক্ষত্রের অবস্থান, বিভিন্ন নিয়ম, জ্যামিতির ধারণা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য ঠিক কোন সময়ের রচনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। মোটামুটিভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের আদি বৈদিক যুগ বলে ধরা যায়। তারপর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত পরবর্তী বৈদিক যুগ। তবে মনে রাখা দরকার, তারপরেও বৈদিক সাহিত্য লেখার কাজ চলেছিল। এখন যে চেহায়ায় বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায় তা অনেক পরের রচনা।

বেদের ভূগোল

বৈদিক সাহিত্যে পর্বত ও নদীর নাম থেকে উপমহাদেশে আর্যদের বসতির কথা বোঝা যায়। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ঋকবেদে ভূগোল বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ঋকবেদে হিমালয় (হিমবৎ) ও কাশ্মীরের মূজবন্ত শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্বতের উল্লেখ নেই। ঋকবেদে অনেক নদীর কথা বলা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় ঐ নদীর কাছাকাছি এলাকাগুলিতেই ছিল আদি

বৈদিক যুগেব বসতি ঋকবেদের আলোচনায় গুবুত্বপূর্ণ নদী ছিল সিন্ধু। সরস্বতী নামে যে নদীর কথা ঋকবেদে বয়েছে, তা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋকবেদের মানুষ গঙ্গা ও যমুনা নদীর এলাকার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। ঋকবেদের একেবারে শেষের দিকে মাত্র একবার গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা পাওয়া যায়।

ঋকবেদের ভূগোল থেকে আদি বৈদিক সভ্যতা কতটা ছড়িয়েছিল তা বোঝা যায় আজকের আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। সিন্ধু ও তার পূর্ব দিকের উপনদীগুলি দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ছিল আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান। এই অঞ্চলটিকে বলা হতো সপ্তসিন্ধু অঞ্চল।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনায় এই ভূগোল আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এলাকার উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনেক বেশি। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদিক-বসতি পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে হরিয়ানাতে সবে গিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পূর্ব ভারতকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার পূর্ব সীমা ছিল উত্তর বিহারের মিথিলা। গঙ্গা নদীর সমভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈদিক সমাজে কৃষির প্রচলন হয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মূল ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল সিন্ধু ও গঙ্গার মাঝের এলাকা। তাছাড়া গঙ্গা উপত্যকার উত্তর ভাগ ও গঙ্গা যমুনা দোয়াবও তার ভেতরে পড়ত।

বৈদিকযুগ ও প্রত্নতত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্যে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের কথা স্পষ্ট শেষদিকের রচনায় লোহার ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়। ঘোড়া ছিল অন্যতম পালিত পশু। ঘোড়ায় টানা বথ ও তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশের হরদ্বার নাগরিক সভ্যতার অবসানের পরের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে। সেগুলি সবই গ্রামীণ সভ্যতার পরিচয় দেয়। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে ঘোড়ার ও পরবর্তী পর্যায়ে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মনে রেখো, আগের থেকে আলাদা কোনো নতুন সভ্যতার চিহ্ন মেলে না। একটা মিশ্র বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে একরকমের মাটির পাত্র বানানো হতো। সেই পাত্রগুলির রং ছিল ধূসর। সেগুলি

টুকরো বখা

মহাকাব্য

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের আরেকটি অংশ হলো মহাকাব্য। মহাকাব্য কথার মানে মহৎ বা মহান কাব্য বা কবিতা। কোনো বিশেষ ঘটনা, দেবতা বা বড়ো রাজবংশের শাসককে নিয়েই মহাকাব্য লেখা হতো। তাবসঙ্গে থাকত ভূগোল, গ্রহ নক্ষত্র ও গ্রাম-নগরের কথা। সমাজজীবনের নানা দিক, রাজনীতি, যুদ্ধ, উৎসবের কথাও মহাকাব্যের মধ্যে মিশে থাকত। সাতটি বা অশ্রুত আটটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা হতো মহাকাব্য। কবির, মূল ঘটনার বা কাব্যের প্রধান চরিত্রের নামে মহাকাব্যের নাম দেওয়া হতো। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সবথেকে জনপ্রিয় মহাকাব্য ছিল বায়ান ও মহাভারত।



গায়ে ছবিও আঁকা হতো। এদের বলা হয় চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র হরিয়ানার ভগবানপুবায (খ্রি পূ ১৬০০-খ্রি-পূ. ১০০০ অব্দ) লোহার ব্যবহারের আগের সময়ের প্রচুর পরিমাণে চিত্রিত ধূসর মাটির বাসন পাওয়া গেছে। এই মাটির পাত্র এলাহাবাদের পূর্বদিকে বিশেষ পাওয়া যায়নি অত্রঞ্জিখেবা, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, নোহ প্রভৃতি জায়গাগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পরের সময়ের মাটির বাসন ও লোহাব ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। এছাড়াও অনেক জায়গায় প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। লোহার তিরের ফলা, বর্শার ফলা, আংটি, পেরেক, ছোরা, বঁড়শি, নানা ধবনের মাটির পাত্র, তামা-ব্রোঞ্জের গয়না, মাটির তৈরি মানুষ ও পশুর মূর্তি পাওয়া গেছে।

১১১

ভেবে দেখো

হবপ্লাব মতো উন্নত পবিকল্পিত নাগরিক সভ্যতাব পর বৈদিক গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে ওঠাব কারণ কী হতে পাবে?

৪.৩ বৈদিক রাজনীতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। কিন্তু তাব থেকে সেই সময়ের বাজনীতি বিষয়ে বেশ কিছু কথা জানা যায় ঋকবেদে যুদ্ধে জিতে লুণ্ঠপাটি চালানোর জন্য দেবতাব আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে। আবাব পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শাসকদেব জন্য বেশ কিছু যজ্ঞের কথাও রয়েছে। তবে রাজনীতিব ঘটনার সরাসরি বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে খুবই কম।

টুকরো কথা

দশ রাজার যুদ্ধ

যুদ্ধেব কথা ঋকবেদে অনেক আছে তার মধ্যে বিখ্যাত হলো দশ রাজার যুদ্ধ। ভরত গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। তার সঙ্গে অন্যান্য দশটি গোষ্ঠীর রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সুদাস দশ রাজার জোটকে হাবিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভবত

গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছিল নদীর ওপর একটি বাঁধ বেড়ে দিয়েছিলেন সুদাস। হয়তো নদীব জলের উপর অধিকার বজায় রাখার জন্যই এমনটা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুটা মিল রয়েছে।



টুংগা যথা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এক জায়গায় রাজা হওয়াব একটা গল্প আছে। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে প্রতিবারই দেবতারা অসুরদের কাছে হেরে যেতেন। চিন্তায় পড়ে দেবতারা জেতার উপায় ঠিক করার জন্য বাসেন আলোচনায়। বোঝা যায় কোনো রাজা না থাকার জন্যই দেবতাদের এই পরিশ্রম।

এবার দেবতারা রাজা খুঁজতে লাগলেন। সবাই একমত হয়ে দেবতাদের মধ্যে সেবা বীর্ষ ইন্দ্রকেই রাজা বাছলেন। ইন্দ্র দেখতেও বেশ ভালো ছিলেন। তাই সবাই তাকেই রাজা মেনে নিলেন। এবার কিন্তু দেবতারা ইন্দ্রের নেতৃত্বে জয়ী হতে থাকলেন।

■ উপরেব গল্পটি পড়ে ভেবে বলো কেন রাজার দবকার হয়েছিল?

ঋকবেদে গ্রাম মানে শুধু গ্রামীণ বসতি নয়। একটি ছোটো জনসমষ্টিকেও গ্রাম বলা হয়েছে। আলাদা কয়েকটি পরিবার নিয়ে সম্ভবত ঐ ছোটো জনগোষ্ঠী বা গ্রাম তৈরি হতো। ঋকবেদে জন, গণ, বিশ প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। সেগুলি দিয়ে গ্রামের থেকে বড়ো একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো। ঋকবেদে যুদ্ধে জেতা ও লুণ্ঠপাটের নানান কথা রয়েছে। গবাদি পশু ও ঘোড়া লুণ্ঠ হতো সবথেকে বেশি।

ঋকবেদে রাজা শব্দের নানান বকম ব্যবহার রয়েছে। রাজা কথার আক্ষরিক অর্থ নেতা। নেতা যে ধ্বনের দায়িত্ব সামলাতেন তার ভিত্তিতেই ঠিক হতো তাঁর নাম। রাজাকে বিশপতি অর্থাৎ বিশ বা গোষ্ঠীর প্রধান বলা হয়েছে। কখনও বা রাজা গোপতি বা গবাদি পশুর প্রভু বলে পরিচিত। ঋকবেদে রাজা মানুষ ও জমির দখল পায়নি। তাই নরপতি বা ভূপতি শব্দগুলির ব্যবহার ঋকবেদে নেই। বিদ্যুৎ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা ঋকবেদে রয়েছে। রাজা ও বিশের সদস্যরা বিদ্যুৎের সদস্য ছিলেন। সেখানে যুদ্ধের কথা আলোচনা হতো। আবার যুদ্ধে লুণ্ঠ করা সম্পদের ভাগ বাঁটোয়াবাও হতো। সেই ভাগাভাগির দায়িত্ব সামলাতেন রাজা। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজা শাসকে পরিণত হয়। তখন তিনি হলেন ভূপতি বা মহীপতি। ভূপতি হলেন ভূ অর্থাৎ জমির পতি বা মালিক। মহীপতি হলেন পৃথিবীর রাজা। রাজ্যের প্রজার বা জনগণের প্রধান হিসাবে রাজার উপাধি হলো নৃপতি বা নরপতি। অর্থাৎ যিনি নৃ বা নর অর্থাৎ মানুষের রক্ষাকারী। এভাবেই গোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠলেন রাজা। জনগণ পরিণত হলো তাঁর অনুগত প্রজায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেবতা ও অসুরদের লড়াই তারই উদাহরণ।

রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন তাকেই রাজ্য বলা হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে উপজাতি বা গোষ্ঠীর নামে অঞ্চলের নাম হতে থাকে। যেমন, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি। এভাবে অঞ্চল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ধারণা গড়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর দখল থাকলে তবেই কেউ রাজা হতে পারত। ধরা হতো সেই অঞ্চলের মানুষেরা ঐ রাজার শাসন মেনে চলবে। শাসনকাজ চালানোর জন্য রাজার কিছু কর্মচারী থাকবে আর থাকবে সেনাবাহিনী।

রাজার কথা এলেই প্রজা র কথাও এসে পড়ে। রাজা যে অঞ্চলে শাসন করতেন সেখানকার বাসিন্দারাই তাঁর প্রজা। প্রজা না থাকলে রাজার শাসন চলবে না। প্রজাদের সমস্যা মেটাবেন রাজা। তার বিনিময়ে প্রজারা রাজাকে মেনে চলবে। এটাই ছিল সেকালের নিয়ম।

প্রাচীনকালে রাজা হওয়ার অনেক উপায় ছিল কেউ যুদ্ধে জিতে রাজা হতেন। আবার কেউবা রাজার ছেলে হিসেবে পরবর্তী রাজা হতেন। কখনও বা গোষ্ঠীর সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে রাজা হিসেবে বাছাই করত। বাজারা অনেক সময় পুৰোহিতদের পবামর্শে নানান বকম যজ্ঞের আয়োজন করতেন। যেমন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ ইত্যাদি। যুদ্ধে যাওয়ার আগে কিছু যজ্ঞ হতো। যুদ্ধ জিতে ফিরে এসেও যজ্ঞ করতেন বাজারা। যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে চাইতেন। শাসকদের জন্য নানাবকম যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের কথা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে।

শাসনের কাজে সাহায্য করতেন যারা, তাদের বত্নিন বলা হতো। হয়তো এদের থেকেই পরে মন্ত্রীর ধারণা এসেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে বিদ্যেব কথা পাওয়া যায় না। তাব বদলে সভা ও সমিতির গুরুত্বের কথা জানা যায়। সভাতে বয়স্ক ব্যক্তিরা যোগ দিতেন। গোষ্ঠীর সবাই সম্ভবত সমিতির সদস্য ছিল। সমিতিতে নানারকম রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হতো।

বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ

ঋকবেদে কৃষির তুলনায় পশুপালনের কথা বেশি পাওয়া যায়। আদি বৈদিক সমাজে গবাদি পশুই ছিল প্রধান সম্পদ। যাব গবাদি পশু বেশি তিনি ধনী বলে পরিচিত হতেন। পশুপালনের ওপর সমাজ বেশি নির্ভর করত বলেই গবাদি পশুর এত গুরুত্ব ছিল। খেয়াল রাখা দরকার ঋকবেদে যুদ্ধ করে জমি দখলের কথা বিশেষ নেই। কারণ ঋকবেদের যুগে সম্পদ হিসাবে জমির গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। তাছাড়া ঘোড়ার চাহিদাও ছিল সম্পদ হিসাবে। আদি বৈদিক যুগে কৃষির প্রসঙ্গ কম হলেও, ছিল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যব ছিল প্রধান। গম ও ধান উৎপাদন হতো কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। আন্তে আন্তে বৈদিক সমাজে কৃষির গুরুত্ব বাড়ছিল।

আদি বৈদিক সমাজে কারিগরি শিল্পের চল ছিল কম। কাঠের কারিগরি শিল্পের কথা জানা যায়। কাঠের আসবাব ও বাড়িঘর তৈরি করা হতো। তাছাড়া বথ তৈরি করতেও কাঠ ব্যবহার হতো। ঋকবেদে চামড়ার শিল্পের কথা রয়েছে। চামড়া দিয়ে থলি, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি বানানো হতো। ভেড়ার লোম থেকে পোশাক বানানোর কথা ঋকবেদে রয়েছে। টানা ও পোড়েন দু'বকমেব সুতো কাপড় বোনায় ব্যবহার হতো। সোনার নানাবকম গয়নার কথাও ঋকবেদ থেকে জানা যায়। তামা দিয়ে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বানানো হতো। ঋকবেদে লোহার কথা নেই। ফলে আদি বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না।

টুকায় বথ

বেদের যুগে কব
দেওয়া-নেওয়া

গোষ্ঠীজীবনে প্রথম দিকে জমির উপর নেতাব কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব চালানোর জন্য তাঁব ধনসম্পদের দরকার ছিল। তা সম্ভবত কৃষি থেকেই পেতেন। শাসকরা ঋকবেদের যুগে শাসকরা কব নিতেন। তবে জোর করে কবের বোঝা প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো না। প্রজারা নিরাপদে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় এক ধবনের কব বাজাকে দিত। ঋকবেদে এই কবই বলি নামে পরিচিত। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে দলপতি সম্ভবত জোর করে বলি কর আদায় করতেন। অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে কব হয়ে উঠেছিল বাধ্যতামূলক। যুদ্ধে যাঁরা হেরে যেত তাঁদের থেকেও বাজারা জোর করে কব আদায় করতেন।

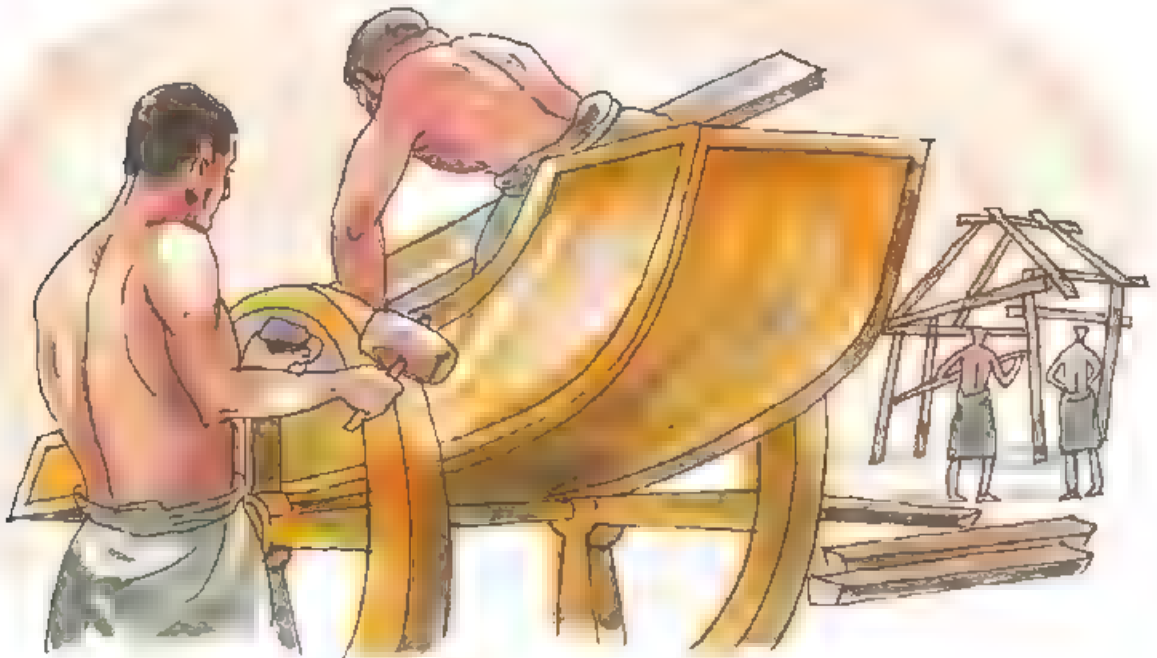


পরবর্তী বৈদিক যুগে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে পাকাপাকি কৃষিকাজ শুরু হয়। এই সময় যবের পাশাপাশি গম ও ধান ছিল প্রধান ফসল। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলানো উচিত, তা নিয়েও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আলোচনা দেখা যায়। লাঙলের ফলা সাধারণত কাঠ বা তামা দিয়ে তৈরি হতো। লোহার লাঙল সম্ভবত তখনও ব্যবহার হতো না।

গঙ্গা অববাহিকায় কৃষিকাজ ও বসতি তৈরির জন্য জঙ্গল পবিষ্কার করা ছিল দবকাবি সম্ভবত বন পুড়িয়ে ফেলা হতো। আবার লোহার অস্ত্র দিয়ে বন কেটে ফেলাও হতো হয়তো। পরবর্তী বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই হতো। লোহার কুড়াল ও কুঠার দিয়ে গঙ্গা উপত্যকার ঘন জঙ্গল সাফ করা সহজ হয়েছিল। লোহার তৈরি লাঙলের ফলা না থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিয়েই তৈরি হতো। লোহার অস্ত্র পরবর্তী বৈদিক যুগের শাসকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

লোহা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার কারিগরি শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগের চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। তার থেকে বোঝা যায় পরবর্তী বৈদিক সমাজে কুমোবের পেশা ছিল। তাছাড়া এসময় কামার, জেলে, রাখাল, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার কথা জানা যায়। গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় তৈরির শিল্প চালু ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে কাজের ভাগাভাগি অনেক বেড়ে গেছিল। এমনকি একটি জিনিস বানাতেও আলাদা আলাদা অংশের কারিগর থাকত। যেমন, ধনুক, ধনুকের ছিলা এবং তির তৈরির আলাদা কারিগর ছিল।

আদি বৈদিক যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ চলন ছিল না। সবাসরি সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা ঋকবেদে নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বেশি পাওয়া যায়। তবে সমুদ্র-বাণিজ্য এই আমলেও ছিল কিনা নিশ্চিত জানা যায় না। বৈদিক যুগে জিনিসপত্র বিনিময় করা হতো। তবে মুদ্রার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না। যদিও *নিষ্ক*, *শতমান* এগুলি হয়তো মুদ্রার মতো ব্যবহার হতো।



ঐতিহ্য বর্ণনা

চতুরাশ্রম

পবিত্র বৈদিক যুগে
জীবনযাপনের চারটি
ভাগ বা পর্যায় ছিল
ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য,
বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস
ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে
থেকে শিক্ষালাভ করা
ছিল ব্রহ্মচর্যশ্রম
শিক্ষালাভের পর বিয়ে
করে সংসার জীবন
যাপনকে বলা হতো
গার্হস্থ্যশ্রম বাণপ্রস্থ
শ্রম বলা হতো
সংসার থেকে দূরে বনে
কুটির বানিয়ে ধর্মচর্চা
করাকে। সবকিছু ভুলে
ঈশ্বরচিন্তায় শেষ জীবন
কটিনোকে বলা হতো
সন্ন্যাস আশ্রম। এই
চারটি পর্যায়কে
একসঙ্গে চতুরাশ্রম
বলা হতো। শূদ্রদের
এই জীবনযাপনের
অধিকার ছিল না।

মনে রেখো

গোষ্ঠীর গবাদিপশু রাখার জায়গাকে বলা হতো গোত্র পবে গোত্রের মানে
দাঁড়ায় একই পূর্বপুরুষ থেকে আসা উত্তরাধিকারী জাতিভেদ প্রথা কঠোর
হওয়ার ক্ষেত্রে গোত্রের জরুরি ভূমিকা ছিল

আদি বৈদিক সমাজে অনেক নারী শিক্ষা লাভ করতেন। এমনকি সমিতির
বৈঠকেও কিছু নারী যোগ দিতেন বলে জানা যায় যুদ্ধেও তাবা অংশ নিতেন।
ঋকবেদে কোথাও বাল্যবিবাহের কথা নেই। সতীদাহ প্রথার কথাও সেখানে
পাওয়া যায় না। যজ্ঞেও নারীরা অংশ নিতে পারতেন।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে নারীদের অবস্থাও খারাপ হয়েছিল মেয়ে জন্মালে
পরিবারে সবাই দুঃখ পেত। ছোটো বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল
যুদ্ধে বা সমিতির কাজে মেয়েদের আর যোগ দিতে দেখা যেত না।

বৈদিক সমাজে পাশাখেলা ছিল খুব জনপ্রিয়। সভা ও সমিতিতেও পাশা
খেলা হতো। রথ ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষ ভিড় করত
গানবাজনারও প্রচলন ছিল বৈদিক সমাজে। যব, গম ও ধান ছিল প্রধান
খাদ্যশস্য। আদি বৈদিক সমাজে নানারকম মাংস খাওয়ারও প্রচলন ছিল



টুকায় বখা

বৈদিক সমাজ ও ধর্ম

বৈদিক যুগে মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হতো মানুষের মতন। কোনো মন্দিরের উল্লেখ নেই বৈদিক সাহিত্যে। ধর্মচর্চা মূলত ছিল আচার অনুষ্ঠান নির্ভর এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক। যজ্ঞে গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি পশু বলি দেওয়া হতো। ঋকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সূর্য, মিত্র, অশ্বিনীদ্বয়, সোম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উষা, সরস্বতী, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য দেবী। যুদ্ধের ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ঋকবৈদিক যুগের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতা সবিতৃ-র উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে বুদ্ধ ও বিষ্ণু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান অনেক গুণ বেড়ে যায়। যজ্ঞে অনেক পশু হত্যা করা হতো। যজ্ঞে দান করা হতো পশু, সোনা ও জমি। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা এভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে ধর্মীয় আচার নিয়মের জন্য। বৈদিক ধর্ম ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপ নিতে লাগল। তবে উপনিষদে নিবাক্যের এক ঈশ্বরের ভাবনা পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা

বৈদিক সাহিত্য থেকেই সেই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা আমবা পাই। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন গুরু। মৌখিকভাবেই শিক্ষার চর্চা হতো। গুরু একটা অংশ পড়ে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্ররা সেই পুরোটা শূনে আবৃত্তি করত ও মনে রাখত। মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের উপরে বিশেষ জোব দেওয়া হতো। বৈদিক যুগের কোনো লিপির খোঁজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা পাননি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিক্ষার সঙ্গে উপনয়নের সম্পর্ক দেখা যায়। ছাত্র শিক্ষা নেওয়ার জন্য গুরুর কাছে আবেদন করত। উপযুক্ত মনে কবলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরু সেই ছাত্রকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতেন। মেয়েদেরও যে উপনয়ন হতো তাবও বেশ কিছু প্রমাণ দেখা যায়। গুরুর কাছে থেকেই ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করত। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্মও ছাত্রদের করতে হতো। ছাত্রদের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব ছিল গুরুর উপরে।

টুকায় বখা

বৈদিক পড়াশোনা ও শ্রুতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত শূনে শূনে মনে রাখতে হতো। তাই বেদের আরেক নাম শ্রুতি। ঋকবেদে ভেকশ্রুতি বলে একটা অংশ আছে। সেখানে বলা আছে একটি ব্যাং ডাকলে অন্যান্য ব্যাং তার মতোই ডাকতে থাকে। ঠিক তেমনি ঋকবেদের সূক্তগুলি মনে করে গুরু বা একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি করত। বাকিরা শূনে শূনে মনে রেখে সেটাই নিখুঁতভাবে বলত। সেক্ষেত্রে নির্ভুল উচ্চারণ করে বৈদিক মন্ত্রগুলি বলার দক্ষতা অর্জন করতে হতো। তাই ছন্দ ও ব্যাকরণ বৈদিক শিক্ষার দুটি প্রধান বিষয় ছিল।

বেদপাঠ কবানোর মধ্যে দিয়েই শিক্ষাদান করা হতো তার সঙ্গে গণিত, ব্যাকরণ ও ভাষাশিক্ষার উপবও জোব দেওয়া হতো হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখতে হতো ছাত্রদের নিজেকে বক্ষা করা ও অস্ত্রচালানো শিখতে হতো। এমনকি ব্রাহ্মণবাও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করত। যেমন, মহাভারত থেকে দ্রোণাচার্য, কৃপ, পবশুবামেব কথা জানা যায়। ছাত্রবা চিকিৎসা করা শিখত। মেয়েবা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নাচ ও গানের চর্চা করত।

৭৭৭

ভেবে দেখো

তোমরা পড়াশোনার সঙ্গে হাতেকলমেও কি কাজ শেখো? হাতেকলমে কী কী শিখেছ?

সাধারণত বারো বছর ধবে শিক্ষা গ্রহণ চলত। অনেকে আবার জীবনভবই ছাত্র থাকত। এমনিতে বাবো বছরের পড়াশোনা শেষ হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতো। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের স্নাতক বলে ঘোষণা করা হতো। পড়াশোনার শেষে ছাত্রদের বিশেষ স্নান করার প্রথা ছিল। তাব থেকেই স্নাতক কথাটা এসেছে। গুবুগুহ ছেড়ে চলে যাবাব আগে ছাত্রবা সাধ্যমতো গুবুদক্ষিণা দিত। গুবুদক্ষিণা হিসাবে গোবুদান করার কথা জানা যায়।

টুকায়ো বখা

একলব্য

ভিলদেব রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু। তাঁর একমাত্র ছেলের নাম একলব্য। একলব্য খুবই সাহসী ও পবিশ্রমী। একলব্যেব ইচ্ছা হলো সে তিব ছুঁড়তে শিখবে। সে শুনেকে গুরু দ্রোণাচার্য খুব বড়ো অস্ত্র-শিক্ষক।

যবে ফিবে বাবাকে দ্রোণাচার্যেব বিষয়ে জানতে চাইল একলব্য। হিবণ্যধনু বললেন, ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য শুধু ক্ষত্রিয় বালকদেবই অস্ত্র শিক্ষা দেন। ভিল বালককে কিছুতেই আচার্য দ্রোণ নিজের শিষ্য করবেন না। সেকথা শুনে একলব্য বলল, তির ছোঁড়া শুধু আচার্য দ্রোণের কাছেই শিখব।

দ্রোণেব কুটিবে গিয়ে একলব্য তাঁকে প্রণাম কবে তাবপরে নিজের পবিচয় দিল। দ্রোণকে বলল, আপনাব কাছে তির ছোঁড়াব শিক্ষা নিতে এসেছি। আমাষ আপনাব শিষ্য করে নিন গুরুদেব। দ্রোণ ভালো করে বুঝিয়েই বললেন, আমি তোমাকে শিষ্য করতে পারব না। আমি শুধু ক্ষত্রিয়দেরই অস্ত্র শিক্ষা দিই। তুমি ভিলকুমার। যবে ফিবে যাও।

টুকায়ো বখা

বৈদিক পড়াশোনা
ও বিজ্ঞানচর্চা

বৈদিক শিক্ষায় গণিতেব চর্চা হতো। যজ্ঞবেদি বানানোব জন্য জ্যামিতিব জ্ঞান প্রয়োজন হতো। যজ্ঞবেদিব ইট পোড়ানো হতো ঠিক মতো ইট বানানো ও পোড়ানোর দায়িত্ব পড়ত ইটেব কারিগরদের ওপর আর যজ্ঞবেদি বানাত মিস্ত্রি আর স্থপতিবা ফলে স্থপতিদেব হাতেই বৈদিক গণিতচর্চা শুবু হয়েছিল। যজ্ঞের বেদি তৈরিতে শ্রমিক, ছুতোব, গণিতবিদদের দরকাব হতো। তাবে ঝকবেদে ইটেব কথা নেই। সেকথা প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদে। যজ্ঞেব বেদি তৈরির জন্য বিভিন্নরকম যন্ত্রেব ব্যবহাব হতো। যজ্ঞ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্র ও কাল, ঝতুর সঠিক ধারণা দরকাব ছিল। সেই চর্চা থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জানা-বোঝা শুবু হয় অথর্ববেদের একটা অংশে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়।

খুব মন খারাপ হয়ে গেল একলব্যর। দ্রোণের কুটির থেকে বেবিয়ে যবেব দিকে ফিরল না। জঙ্গলে গিয়ে সে মাটি দিয়ে আচার্য দ্রোণের একটা মূর্তি তৈরি করল আর একই ঐ মূর্তির সামনে তির ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। একটানা অভ্যাস চালিয়ে গেল একলব্য। এভাবে অনেকদিন পর সে সত্যিই বিরাট তিবন্দাজ হয়ে উঠল।

একদিন সেই মূর্তির সামনে একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে হঠাৎ একটা কুকুবেব চিৎকারে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তির ছুঁড়ে কুকুবটার মুখ আটকে দিল একলব্য। সেই অবস্থায় কুকুবটা দৌড়ে চলে গেল কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের কাছে। কুকুবেব অবস্থা দেখে তারা বুঝল এভাবে তিব মাঝে আশ্চর্যের ব্যাপার। অর্জুনও এত অসাধারণ তির ছুঁড়তে পারে না। দ্রোণাচার্য চমকে উঠলেন কুকুবটাকে দেখে।

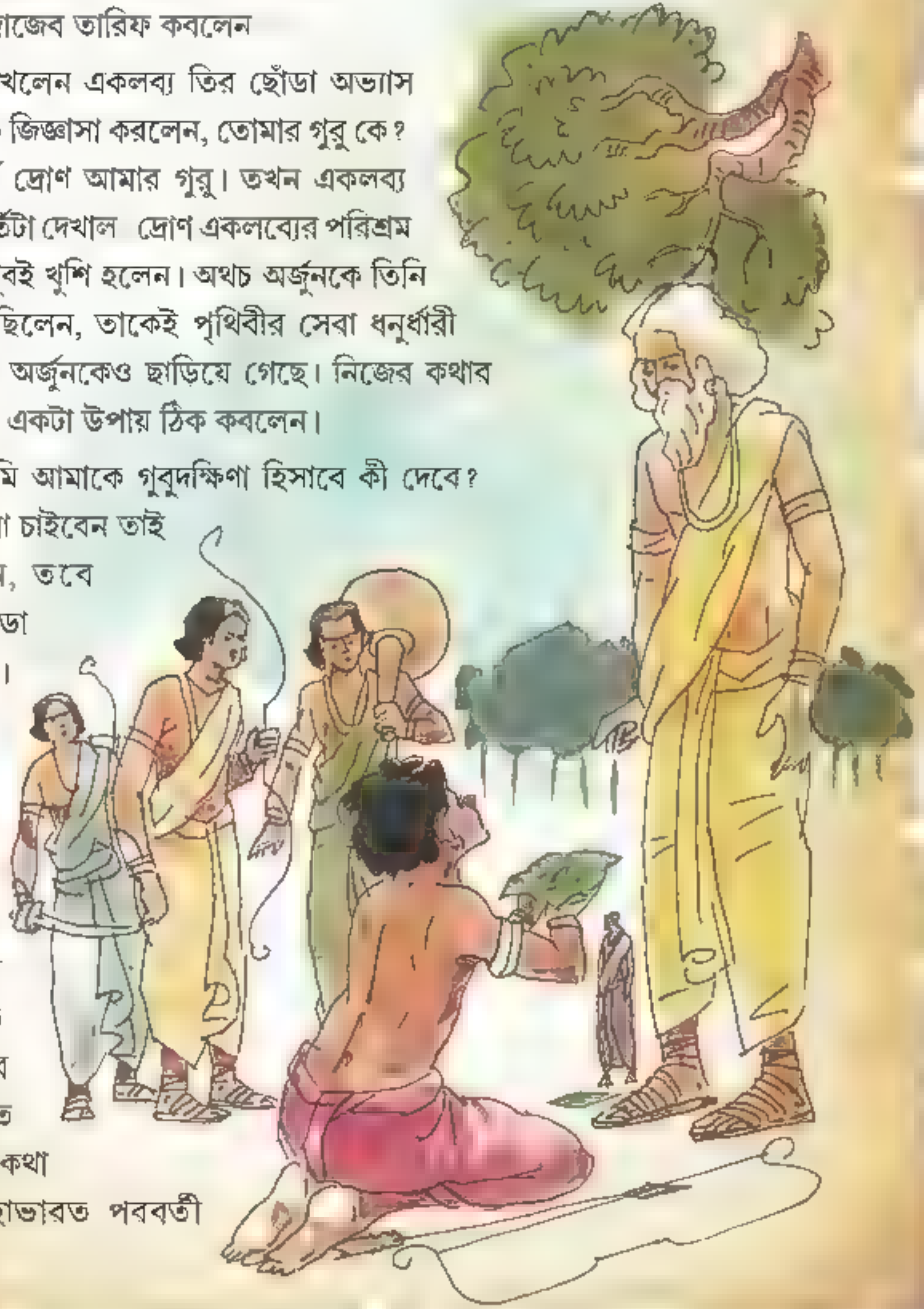
তিনি মনে মনে ঐ তিবন্দাজের তারিফ কবলেন

কিছুদূর গিয়েই দ্রোণ দেখলেন একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে। তিনি একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গুরু কে? একলব্য জানাল, আচার্য দ্রোণ আমার গুরু। তখন একলব্য সবাইকে দ্রোণাচার্যের মূর্তিটা দেখাল। দ্রোণ একলব্যের পরিগ্রহ ও শেখার আগ্রহ দেখে খুবই খুশি হলেন। অথচ অর্জুনকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাকেই পৃথিবীর সেবা ধনুর্ধারী বানাবেন। কিন্তু একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিজের কথার খেলাপ হবে ভেবে দ্রোণ একটা উপায় ঠিক কবলেন।

একলব্যকে বললেন, তুমি আমাকে গুবুদক্ষিণা হিসাবে কী দেবে?

একলব্য বলল, আপনি যা চাইবেন তাই দেবো। দ্রোণ বললেন, তবে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আমায় দাও। নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে দ্রোণকে দিয়ে দিল একলব্য।

এর পর একলব্য তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল ছাড়াই তির ছুঁড়তে শিখেছিল। তবু আগের মতো সে আর তির ছুঁড়তে পারতো না। একলব্যের কথা মহাভারতে আছে। মহাভারত পর্ববর্তী বৈদিক যুগের বচন।



৪.৪ বৈদিক যুগে অন্যান্য সমাজ

পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বৈদিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েনি। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই বৈদিক বসতি ছিল। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে বৈদিক সভ্যতা ছিল না। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এসময়ে অন্যরকম সংস্কৃতির খোঁজ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। সেই সংস্কৃতিগুলিতে মানুষ পাথর ও তামার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। কালো ও লাল রঙের মাটির পাত্র তারা ব্যবহার করত। মাটির তৈরি ভাঙা বাড়িঘরও খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পশ্চিমবঙ্গে মহিষদলে তেমনই একটি সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে গ্রামীণ কৃষিসমাজ ছিল বলে জানা যায়। তাবা মৃতদেহকে সমাধি দিত। এমনই একটি সমাজের খোঁজ পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁওতে।

মেগালিথ

মেগালিথ হলো বড়ো পাথরের সমাধি। প্রাচীন ভারতে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে এই সমাধির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের সমাধি চিহ্নিত করত। বড়ো পাথর দিয়ে চিহ্নিত এই সমাধিগুলোর নানা বকমফের দেখতে পাওয়া যায় কোথাও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা বড়ো একটি পাথর। কোথাও বৃত্তাকারে সাজানো অনেক পাথর। কোথাও অনেকগুলো পাথর ঢাকা দেওয়া রয়েছে একটা বড়ো পাথর দিয়ে। কোথাও বা পাহাড় কেটে বানানো গুহার ভেতর সমাধি। এইসব সমাধিগুলো থেকে মানুষের কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের বুরজাহোম, রাজস্থানের ভরতপুর, ইনামগাঁও বিখ্যাত মেগালিথ কেন্দ্র। তবে এই বড়ো পাথরের সমাধিগুলো বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতে। এইসব জায়গায় কালো বা লাল মাটির বাসন, পাথর, পোড়ামাটির তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া লোহা, সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জের জিনিসও রয়েছে। ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুর হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। ব্যবহার করা জিনিসের তফাত থেকে বোঝা যায় এইসব সমাজে ধনী-দরিদ্র ভাগ ছিল। জানা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় একসঙ্গে একটি পরিবারের সমাধি দেওয়া হতো।



১১১

ভেবে দেখো

লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার শুরুর হওয়ার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে কী কী বদল ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

ছবি ৪.১:

একটি মেগালিথ

মনে রেখো

ছোটোনাগপুরে মুন্ডা, আসামে খাসিদের মধ্যে মেগালিথ ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, হুগলি ও পুর্নালিয়ায় এমন সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়।

টুংরা বখা

একনজরে ইনামগাঁও

- ★ মহাবাহুর পুণে জেলার একটি প্রত্নক্ষেত্র একটি মেগালিথ কেন্দ্র
- ★ ভীমা নদী উপত্যকার এই কেন্দ্রে খ্রি পূ ১৪০০ থেকে খ্রি পূ ৬০০ অব্দ সময়কালের মানুষের বাস ছিল
- ★ কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা।
- ★ আয়তাকার প্রায় ১৩৪ টি ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
- ★ ৬ মিটার চওড়া, ৪২০ মিটার লম্বা একটি সেচখালের অবশেষ পাওয়া গেছে।
- ★ গম, যব, ডাল ও ধান ছিল প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য।
- ★ বাড়িতে শস্য মজুত রাখার জালা, আগুন জ্বালানোর গর্ত পাওয়া গেছে। বাড়ির লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রও পাওয়া গেছে
- ★ দামি পাথরের হাব পবা দু বছরের বাচ্চা মেয়েস সমাধি পাওয়া গেছে।
- ★ পাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে ষাঁড়ে টানা গাড়ির ছবি।
- ★ মাথাসমেত ও মাথা ছাড়া দুটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে।
- ★ প্রতিটি বাড়িতেই মাটির পাঁচিল, মাংস ঝালসাবার জন্য উনুন ছিল।
- ★ শেষপর্বে আয়তাকার বাড়ির বদলে ছোটো গোলাকার কুঁড়ে তৈরি হতে থাকে।
- ★ কালো ও লাল মাটির বাসনপত্র, লোহার জিনিস ইত্যাদি পাওয়া গেছে।
- ★ পর্বের দিকে ঘোড়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে
- ★ পাঁচটি ঘরওলা একটি বড়ো বাড়িতে উত্তরে মাথা কবা একটি সমাধি পাওয়া গেছে। হয়তো সেটা ছিল গোষ্ঠীপতির সমাধি।

ছবি ৪.২:
মেগালিথ কেন্দ্র



ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ১.১) আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার প্রধান উপাদান— (জেন্দ অবস্থা/মহাকাব্য/ঋকবেদ)
- ১.২) মেগালিথ বলা হয়— (পাথরের গাড়ি/পাথরের সমাধি/পাথরের খেলনা) কে
- ১.৩) ঋকবেদে রাজা ছিলেন—(গোষ্ঠীর প্রধান/রাজ্যের প্রধান/সমাজের প্রধান)।
- ১.৪) বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধান ছিলেন — (রাজা/বিশপতি/বাবা)

২। যেমানান শব্দটি খুঁজে লেখো :

- ২.১) ঋকবেদ, মহাকাব্য, সামবেদ, অথর্ববেদ
- ২.২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নৃপতি
- ২.৩) ইনামগাঁও, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী
- ২.৪) উষা, অদিতি, পৃথিবী, দুর্গা

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৩.১) বেদ শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। এব কাবণ কী বলে তোমার মনে হয়?
- ৩.২) বৈদিক সমাজ চারটি ভাগে কেন ভাগ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?
- ৩.৩) বৈদিক যুগের পড়াশোনায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল বলে মনে হয়?
- ৩.৪) আদি বৈদিক ও পববর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থার কি কোনো বদল হয়েছিল? বদল হয়ে থাকলে কেন তা হয়েছিল বলে মনে হয়?

৪। হাতেকলমে করো :

- ৪.১) বৈদিক সমাজে বাজার ধারণার বদল একটি চার্টের সাহায্যে দেখাও
- ৪.২) বৈদিক সমাজে জীবিকাগুলির একটি চার্ট তৈরি করো।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন - উত্তর ভারত

একটু থেমে বুবিব দাদু জানতে চাইলেন, তোমরা রূপকথার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ? আজ দাদু ওদের রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন যদিও ওরা ক্লাস সিলে পড়ে, তবুও রূপকথার গল্প শোনার মজাই আলাদা। কত রাজা, বানি, বাজপুত্র, বাজকন্যা সঙ্গে আছে পক্ষীবাজ ঘোড়া, তেপান্তবেব মাঠ। সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট কিন্তু রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে পলাশের মনে একটা ভাবনা আসে। রূপকথায় রাজার নাম থাকে না। সেই বাজা কবে, কোথায় ছিলেন তাও বলা থাকে না। দিদিমণি বলেছিলেন, রূপকথা ইতিহাস নয়। পলাশের খুব জানতে ইচ্ছা করে ইতিহাসের রাজা-রানীদের কথা। পরদিন ক্লাসে সেই ইচ্ছার কথাই জানাল পলাশ। দিদিমণি বললেন, বেশ তো, এবারে তাহলে বাজার কথাই হোক।

৫.১. জনপদ থেকে মহাজনপদ

প্রাচীন ভাবে গ্রামের থেকে বড়ো অঞ্চলকে জন বলা হতো। সেই জন-কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল ছোটো ছোটো রাজ্য। এইভাবে জন শব্দ থেকেই জনপদ শব্দটি এসেছিল। আরেক দিক থেকে সাধারণ মানুষ বা জনগণ যেখানে বাস করত তাকে বলা হতো জনপদ। অর্থাৎ জনগণ যেখানে পা বা পদ রাখেন, সেটাই জনপদ। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকলে তা জনপদ হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে এইরকম অনেকগুলি জনপদের কথা জানা যায়। সেসব জনপদগুলি অনেক সময়েই পরিচিত হতো সেখানকার শাসক বংশের নামে। এই জনপদগুলিকে ভিত্তি করেই পবেব দিকে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভাবতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এরকম জনপদের খোঁজ পেয়েছেন। মগধের মতো কয়েকটি জনপদ আস্তে আস্তে মহাজনপদে পবিণত হয়।



খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ একেকটা জনপদের ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। সেখানকার শাসকবা যুদ্ধ করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে থাকেন। ছোটো ছোটো জনপদগুলির কয়েকটি পরিণত হয় বড়ো রাজ্যে। এই বড়ো রাজ্যগুলিই **মহাজনপদ** বলে পরিচিত হয়। জনপদের থেকে যা আয়তন ও ক্ষমতায় বড়ো তাই **মহাজনপদ**। মহাজনপদগুলির শাসকবা ছিলেন বৈদিক যুগের রাজাদের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁদের হাতে অনেক সম্পদ জমা হলো। সেই সম্পদ ব্যবহার করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা আরো বাড়াতে চাইলেন। ফলে প্রায়শই লেগে থাকত যুদ্ধ।

ষোড়শ মহাজনপদ

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও জনপদ-মহাজনপদের আলোচনা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে যোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়। সেইসময়ে এদেরকে একসঙ্গে **ষোড়শ মহাজনপদ** বলা হতো। মহাজনপদগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। একে অন্যের রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইত। এইভাবে ক্রমে যোলোটি মহাজনপদ ক্রমে ক্রমে চারটে মহাজনপদে এসে দাঁড়াল। এগুলি হলো অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারটে মহাজনপদ আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত মগধ হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি শক্তিশালী।

যোলোটি মহাজনপদের বেশিভাগই ছিল আজকের মধ্য ও উত্তর ভারত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল অশ্বক। মানচিত্র (৫.১) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাকে ভিত্তি করেই বেশিভাগ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছিল সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতির মূল কেন্দ্র।



বিবাত গঙ্গা উপত্যকা ছিল একটি সমতল অঞ্চল। ফলে রাজ্য জন্মের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধা ছিল না। যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ায় ফলে পলিমাটির জমি ছিল উর্বর চাষ হতো খুবই ভালো। পাশাপাশি গভীর বনও ছিল। বনে কাঠ থেকে হাতি সবই পাওয়া যেত। নদীপথে যাতায়াত করারও সুবিধা ছিল। এসবের ফলেই ঐ অঞ্চলের মহাজনপদগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

মহাজনপদের শাসন ব্যবস্থা

অধিকাংশ মহাজনপদেই ছিল রাজার শাসন সেই মহাজনপদগুলিকে বলা হতো রাজতান্ত্রিক রাজ্য। রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা রাজা বিশেষ কোনো বংশের সদস্য ছিলেন সেই বংশই বছরের পব বছর রাজত্ব করত। একসময়ে তাদের হাবিয়ে অন্য বংশের কেউ আবার রাজা হতেন। শাসনের কাজে রাজাকে সাহায্য করত একটি সভা তার সদস্যরা রাজাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যগুলিতে জমি জরিপ করে কর সংগ্রহ করা হতো কর থেকে পাওয়া টাকায় রাজ্যের শাসন কাজের খরচ চলত।



এরকম একটি রাজতান্ত্রিক মহাজনপদ ছিল মগধ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে মগধ ছিল দক্ষিণ বিহারের একটি সামান্য এলাকা। কিন্তু দক্ষ রাজাদের নেতৃত্বে মগধ আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। সেকালে মগধ বলতে এখনকার বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে বোঝাত। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। পবে পাটলিপুত্র রাজধানী হয়ে যায়।

মগধ রাজ্য নদী ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে মগধ সহজেই বেঁচে যেতে পারত। গঙ্গা নদীর পলিমাটি ঐ অঞ্চলের কৃষিজমিকে উর্বর করে তুলেছিল। মগধ অঞ্চলের ঘন বনগুলিতে অনেক হাতি পাওয়া যেত। সেই হাতিগুলি মগধের রাজারা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি সেখানে অনেকগুলি লোহা ও তামার খনি ছিল। ফলে মগধের রাজারা সহজেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন। জল ও স্থলপথে মগধের বাণিজ্য চলত। এসব সুবিধার ফলে মগধই শেষপর্যন্ত সবথেকে শক্তিশালী মহাজনপদে পরিণত হয়।

কয়েকটি মহাজনপদ ছিল অরাজতান্ত্রিক। সেখানে কোনো রাজার শাসন ছিল না। সেগুলিকে বলা হতো গণরাজ্য। এরকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণরাজ্য ছিল মল্ল ও বজ্জি বা বৃজি। সাধারণভাবে গণরাজ্যগুলিতে একে একটি উপজাতি বাস করত। তারা নিজেব নিজেব রাজ্যে অরাজতান্ত্রিক শাসন বজায় রেখেছিল।

রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে গণরাজ্যগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের জন্য দবকাব হতো অনেক সৈন্য। সৈন্যদের জন্য খরচ হতো অনেক। সেই খরচের অর্থ জোগাড় করা হতো প্রজাদের ওপর কব বসিয়ে। গণরাজ্যগুলিতে সেই বাড়তি কর আদায় করা সহজ ছিল না। পাশাপাশি সেগুলির মধ্যে গোষ্ঠীবিবাদ পাকিয়ে ওঠে। ফলে গণরাজ্যগুলির পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

টুকায় বন্ধ

বজ্জীদের উন্নতির সাতটি নিয়ম

মগধের রাজা অজাতশত্রু একবার বজ্জীদের বিবৃদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের মতামত জানতে তিনি একজন কর্মচারীকে বুদ্ধের কাছে পাঠান। বুদ্ধ তখন নিজের শিষ্য আনন্দের সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। ঐ আলোচনায় বজ্জীদের দেওয়া বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে সাতটি নিয়মের কথা ওঠে। বুদ্ধ বলেন, সেই নিয়মগুলি মেনে চললে বজ্জীদের উন্নতি আটুট থাকবে। রাজা অজাতশত্রু কোনোভাবেই বজ্জীদের হারাতে পাবেন না সেই নিয়মগুলি হলো—

- বজ্জীদের প্রায়ই সভা করে রাজ্য চালাতে হবে।
- বজ্জীদের সব কাজ সবাই মিলে একজোট হয়ে করতে হবে।
- বজ্জীদের নিজেদের বানানো আইন অনুসারে চলতে হবে
- বজ্জীসমাজে বয়স্ক মানুষদের কথা শূনে চলতে হবে ও তাদের সম্মান করতে হবে।
- বজ্জীসমাজে নারীদের সবসময় সম্মান করে চলতে হবে।
- বজ্জীদের সমস্ত দেবতার মন্দিরগুলির যত্ন নিতে হবে
- নিজেদের অঞ্চলে গাছপালা ও পশুপাখিদের উপর অত্যাচার করা যাবে না

৫.২ নব্যধর্ম আন্দোলন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বদলাতে শুরু করে। কৃষি হয়ে ওঠে বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা। লোহার লাঙলের ব্যবহার বাড়ায় ফসলের উৎপাদন খুব বেড়ে যায়। পাশাপাশি নতুন নতুন নগর এই সময় গড়ে উঠছিল। সেগুলির বাসিন্দাদের একটা বড়ো অংশ ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী ছিল

১১১

ভেবে দেখো

গৌতম বুদ্ধ বজ্জীদের যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনগুলো আজও মেনে চলা উচিত? তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

যজ্ঞ, পশুবলি ও যুদ্ধেব ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নানা ক্ষতি হতো। চাষের কাজে গবাদিপশুর প্রয়োজন হতো। তাই যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া কৃষকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। পাশাপাশি বিভিন্ন জনপদ ও উপজাতিগুলির মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ব্যবসার ক্ষতি করেছিল। অথচ নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাও ব্যবসার জন্য জরুরি ছিল। ধর্মের নামে বেড়েছিল আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান। আগে সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিভাগ ছিল কিন্তু পরে তা জন্মগত হয়। আর এভাবে প্রবল হয় জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই সমাজে নতুন ধর্মমতের চাহিদা তৈরি হয়েছিল।

বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হতো। অথচ সমুদ্রযাত্রাকে পাপ হিসাবে দেখত ব্রাহ্মণেরা। ব্যবসা চালাতে গেলে পয়সাব লেনদেন ও সুদে টাকা খাটানোর দরকার পড়ত। কিন্তু সুদ নেওয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিন্দার বিষয় ছিল।

লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল ফলে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সমান ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বদলে নতুন সহজ সরল ধর্মের খোঁজ শুরু হয়েছিল। সেই চাহিদা পূরণ করেছিল বেশ কিছু ধর্ম, যার মধ্যে প্রধান দুটি হলো জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল এইসব ধর্মগুলি। সহজ সরল জীবনযাপনের ওপরে তারা জোর দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও বেদের বিরোধিতা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলেছিলেন এইসব ধর্মের প্রচারকরা। নতুন এই ধর্মমতগুলিকেই নব্যধর্ম (নতুন ধর্ম) বলা হয়।

জৈন ধর্ম

নতুন তৈরি হওয়া ধর্মমতগুলির মধ্যে জৈন ধর্ম ছিল অন্যতম প্রধান। এই ধর্মের প্রধান প্রচারককে বলা হতো তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেষ দুজন হলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীৰ। পার্শ্বনাথ ছিলেন কাশীর বাজপুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীৰের প্রায় আড়াইশো বছর আগের মানুষ।

বর্ধমান মহাবীৰ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮) লিচ্ছবি বংশের ক্ষত্রিয় বাজকুমার ছিলেন। বজ্জি জনপদের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যোগাযোগ ছিল। ত্রিংশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। টানা বারো বছর অনেক কষ্ট মেনেও তপস্যা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি সর্বজ্ঞানী হন ও কেবলিন নামে পরিচিত

টুকরো কথা

চার্বাক ও আজীবিক

জৈন ও বৌদ্ধদেব আগেও ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন চার্বাক ও আজীবিক গোষ্ঠী। এঁরা কেউই বেদকে চূড়ান্ত বলে মানতেন না। চার্বাকরা বর্ণাশ্রম প্রথা'র বিরোধী ছিলেন। তাঁরা স্বর্গের ধারণা মানতেন না। যজ্ঞে পশুবলি'র বিরোধী ছিলেন চার্বাকরা। আজীবিক গোষ্ঠী তৈরি করেন মংখলিপুত্র গোসাল। জানা যায় তিনি ছিলেন মহাবীৰের বন্ধু। আজীবিকরা বেদ ও কোনো দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মানতেন না যে, মানুষ ভালো কাজ করলেই ভালো ফল পাবে। আজীবিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তাঁরা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার ও অশোকের থেকেও সহায়তা পেয়েছিলেন।

ছবি. ৫.১:
বর্ধমান মহাবীর

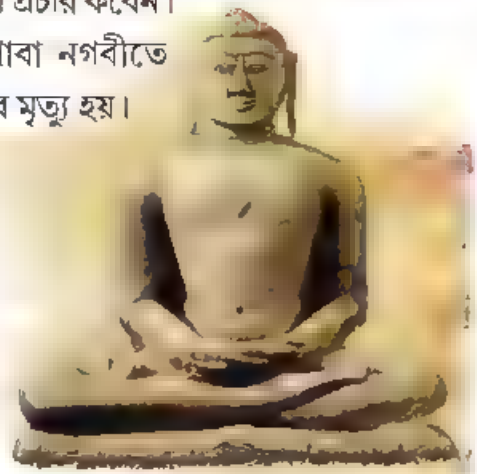
হন। দীর্ঘ তিবিশ বছর মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করেন।
আনুমানিক বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরীতে
অনশন করেন মহাবীর। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

টুকায় বর্ণনা

চতুর্থাং ও পঞ্চমহাব্রত

জৈন ধর্মে চারটি মূলনীতি অবশ্যই
মেনে চলতে হতো। সেগুলি হলো—
ক) কোনো প্রাণী হত্যা না করা।

খ) মিথ্যাকথা না বলা গ) অন্যের জিনিস ছিনিয়ে না নেওয়া ঘ) নিজেব
জন্য কোনো সম্পত্তি না কবা পার্শ্বনাথ এই চারটি মূল নীতি মেনে চলাব
নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নীতি চারটিকেই একসঙ্গে চতুর্থাংব্রত বলা হয়।
মহাবীর এই চারটি নীতির সঙ্গে আবার একটি নীতি যোগ করেন তাঁর মতে,
ব্রহ্মচর্য নীতিও জৈনদের মেনে চলা উচিত। এই পাঁচটি নীতিকে একসঙ্গে
পঞ্চমহাব্রত বলা হয়।



গোড়ার দিকে জৈন ধর্ম মগধ, বিদেহ, কোশল ও অঙ্গবাজ্যের মধ্যে জনপ্রিয়
ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বাড়তে থাকে। জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
শেষ জীবনে জৈন হয়ে যান। পরে ওড়িশা থেকে মথুরা পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছড়িয়ে
পড়েছিল। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলি বারোটি ভাগে সাজানো হয়েছিল।
এই ভাগগুলিকে অঙ্গ বলা হয় সংখ্যায় বারোটি বলে অঙ্গগুলিকে একসঙ্গে
বলা হয় দ্বাদশ অঙ্গ।

টুকায় বর্ণনা

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের শেষ দিকে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় সেইসময় অনেক
জৈন সন্ন্যাসী উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে দক্ষিণাত্যে চলে যান। এ চলে যাওয়া
থেকেই জৈনদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায় দক্ষিণাত্যে চলে যাওয়া জৈন
সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি বর্ধমান মহাবীরের পথকেই কঠোরভাবে
মেনে চলতেন মহাবীরের মতোই ভদ্রবাহু ও তার অনুগামীরা কোনো পোশাক
পরতেন না। এরা জনোই তাঁদের দিগম্বর বলা হয়

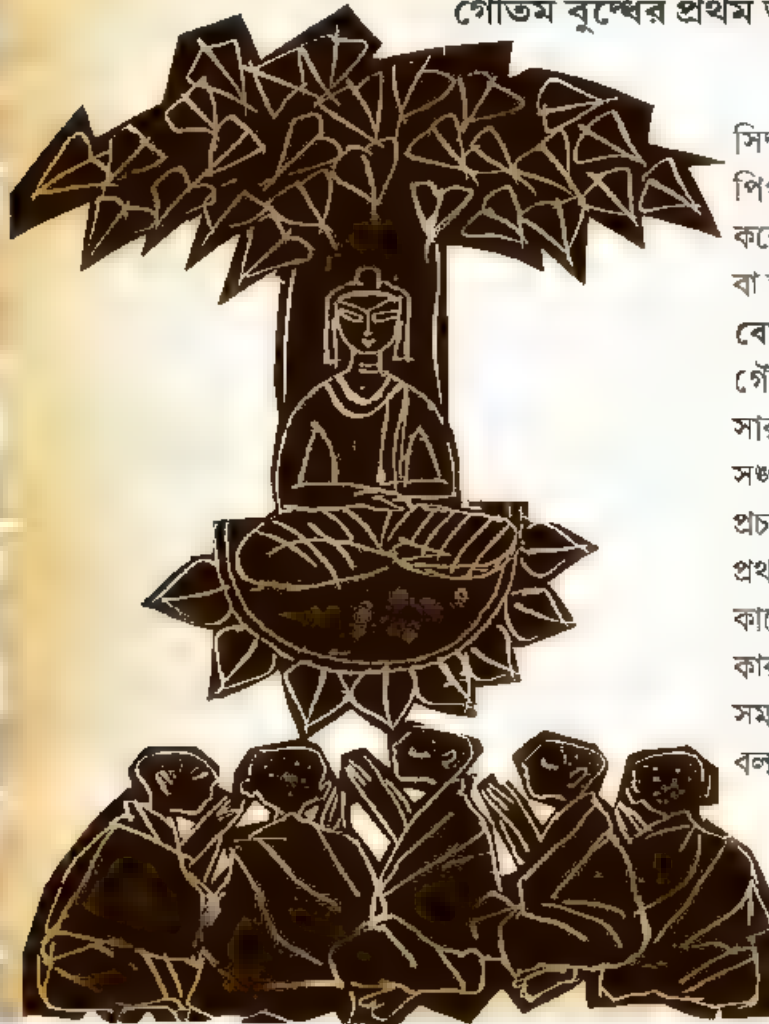
অন্যদিকে উত্তর ভারতে থেকে যাওয়া জৈনদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। তিনি পার্শ্বনাথের মতো জৈনদের একটা সাদা কাপড় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জৈন সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী শ্বেতাম্বর বলে পরিচিত হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের বিভেদ পবিত্র হতে থাকে। তবে জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ তফাত ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধের প্রথম নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নেপালের তবাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর শাক্য বংশে সিদ্ধার্থের জন্ম হয় (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দ)। সিদ্ধার্থও মহাবীরের মতোই ক্ষত্রিয় বংশের মানুষ ছিলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। প্রায় ছ-বছর তপস্যা করার পর সিদ্ধার্থ বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করার জন্যই তার নাম হয় বুদ্ধ। তাই বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম।

টুকরো কথা

গৌতম বুদ্ধের প্রথম উপদেশ



সিদ্ধার্থ গয়ায় কাছাকাছি একটি পিপল গাছের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন। সেখানেই তাঁর বোধি বা জ্ঞান লাভ হয় বলে এই গাছটিকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়। গয়া থেকে গৌতম বুদ্ধ বারাণসীর কাছে সারনাথে যান। সেখানে পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে তাঁর উপদেশ প্রথম প্রচার করেন। এই পাঁচজনই তাঁর প্রথম পাঁচ শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি মানুষের জীবনে দুঃখের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাকে ধর্মচক্র প্রবর্তন বলা হয়েছে।



ছবি. ৫.২:
ধ্যানে বসা গৌতম বুদ্ধের
একটি মূর্তি

বুদ্ধ নিজের শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন দুঃখের কারণ কী? কীভাবে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যায় বুদ্ধ চারটি মূল উপদেশ দেন। প্রতিটি উপদেশকে বলা হয় *আর্যসত্য*। ঐ চারটি উপদেশকে একসঙ্গে *চতুর্বার্যসত্য* বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আটটি উপায়ের কথা গৌতম বলেছিলেন। সেই আটটি উপায়কে একসঙ্গে বলা হয় *অষ্টাঙ্গিক মার্গ*। *মার্গ* মানে পথ। আটটি পথকে তাই একসঙ্গে *অষ্টাঙ্গিক মার্গ* বলা হয়।

এবপর বুদ্ধ রাজগৃহে যান। সেখানে মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হন। বছরে আট মাস ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর মতামত প্রচার করতেন। কোশল রাজ্যে গৌতম বুদ্ধ টানা ২১ বছর ছিলেন। প্রায় ৪৫ বছর ধর্মপ্রচারের পর কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ মারা যান (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রি:পূ:)।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে *বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি*গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসংগীতি অনেকটা ধর্মসম্মেলনের মতো। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন। বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। সংগীতিগুলিতে নানা বিবাদের প্রসঙ্গও উঠত। এমন চারটি সংগীতির কথা জানা যায় গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পরে পরেই প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি হয়েছিল।

তালিকা ৫.১: একনজরে প্রথম চারটি বৌদ্ধ সংগীতি

প্রথম	রাজগৃহ	অজাতশত্রু	মহাকাশ্যপ	সূত্র ও বিনয় পিটক সংকলন করা হয়
দ্বিতীয়	বৈশালী	কাল্যাপক বা কাকবর্ণ	যশ	বৌদ্ধরা খেরবাদী ও মহাসাংঘিক এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান
তৃতীয়	পাটলিপুত্র	অশোক	মোগগলিপুত্র তিসস	বৌদ্ধ সংঘের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মানার উপরে জোর পড়ে সংঘের মধ্যে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা হয়
চতুর্থ	কাশ্মীর	কনিষ্ক	বসুমিত্র	বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়



↑ ছবি ৫.৪.

সামেত শিখর, জৈনদের
পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। মনে করা
হয় ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে
২০ জন এই শিখরেই নির্বাণ
লাভ করেছিলেন।



← ছবি ৫.৫

বুদ্ধপদ (গৌতম বুদ্ধের পায়ের
ছাপ), পাথরে খোদাই করা
ভাস্কর্য, অমরাবতী পায়ের
ছাপের মাঝে ধর্মচক্র রয়েছে

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ১.১) মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল ——— (খ্রি ষষ্ঠ শতকে/খ্রি পূ ষষ্ঠ শতকে/খ্রি ষষ্ঠ সহস্রাব্দে)।
- ১.২) গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন ——— (লিচ্ছবি/ হর্যঙ্ক/শাক্য) বংশে।
- ১.৩) পার্শ্বনাথ ছিলেন ——— (মগধের রাজা/বজ্জিদের প্রধান/জৈন তীর্থংকর)
- ১.৪) আর্যসত্য ——— (বৌদ্ধ/জৈন/আজীবিক) ধর্মের অংশ।

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ		খ-স্তম্ভ	
মগধের রাজধানী		বৌদ্ধ ধর্ম	
মহাকাশ্যাপ		রাজগৃহ	
দ্বাদশ অঙ্গ		প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি	
হীনযান-মহাযান		জৈন ধর্ম	

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৩.১) মগধ ও বজ্জি মহাজনপদদুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য তোমাব চোখে পড়ে?
- ৩.২) কী কী কারণে মগধ শেষ পর্যন্ত বাকি মহাজনপদগুলির থেকে শক্তিশালী হলো? সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?
- ৩.৩) সমাজের কোন কোন অংশের মানুষ নব্যধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন কবেছিলেন? কেন কবেছিলেন?
- ৩.৪) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে কী কী মিল ও অমিল তোমাব চোখে পড়ে?

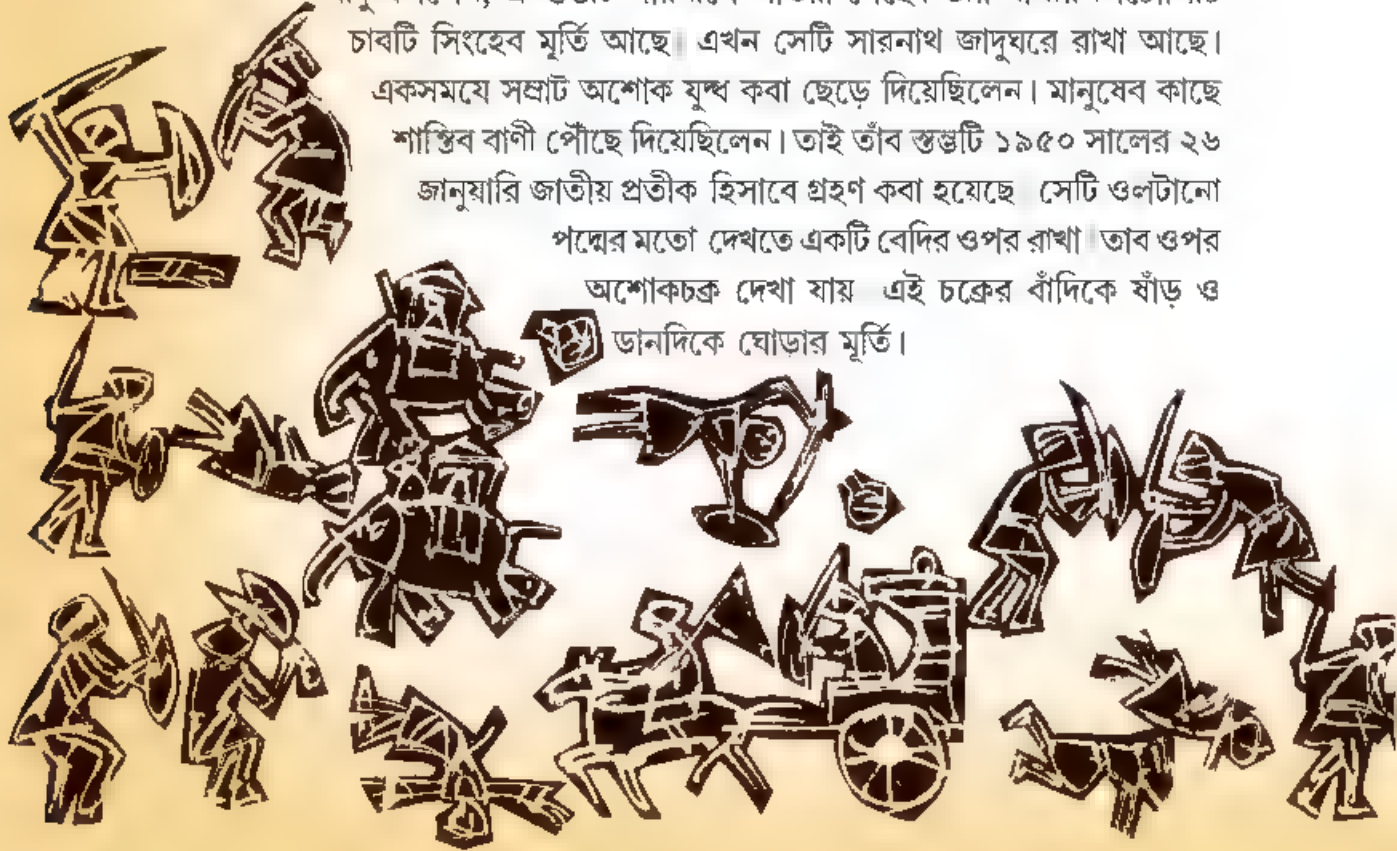
৪। হাতেকলমে করো :

- ৪.১) জনপদ থেকে ষোলোটি মহাজনপদ এবং তার থেকে মগধ রাজ্য কীভাবে হলো, তা পিঝামিডের আকারে দেখাও।
- ৪.২) ৬৪ ও ৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা জোড়া ছবিটি দেখো। বৌদ্ধ ধর্মে আর্যসত্যের ধারণার সঙ্গে ঐ ছবিটির কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছে?

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয়
সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

সামিমের কাছে পুরোনো দিনের অনেকগুলো পয়সা আছে। ওর নানা ওকে দিয়েছিলেন। ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা। কোনোটা চৌকো, কোনোটা ফুলের মতো। স্টিলের চকচকে ছোটো গোল দশ পয়সাগুলো সামিমের খুব প্রিয়। পুরোনো কয়েকটা ২ টাকার নোটও আছে ওর। একদিন সবগুলোই বন্ধুদের আর বুঝির দাদুকে দেখাতে নিয়ে গেল। দাদু সব দেখে বললেন, দারুণ তো। তোমরা আর কেউ কিছু জমাও নাকি? পলাশ বলল, আমি খেলনা জমাই। ছোটোবেলার সব খেলনা রয়েছে আমার। রাবেয়া বলল, আমিও খেলনা জমাই। দাদু বললেন, পুরোনো দিনের নানান জিনিস জমিয়ে বাখা ভালো। তাতে একসময়ে বোঝা যাবে সেই জিনিসগুলো কেমন ছিল পুরোনো দিনে। তাবপব বললেন, এই যে টাকায় বা পয়সায় সিংহের মুখওলা একটা ছাপ থাকে সেটা কী বলোতো? সবাই বলল, অশোকস্তম্ভ। দাদু বললেন, কেন ঐ স্তম্ভটা টাকা পয়সায় ছাপা থাকে জানো? রাবেয়া বলল, সম্রাট অশোকের ঐ স্তম্ভটাই ভারতের জাতীয় প্রতীক।

দাদু বললেন, ঐ স্তম্ভটি সারনাথে পাওয়া গেছে। তার মাথায় পিঠোপিঠি চাবটি সিংহের মূর্তি আছে। এখন সেটি সারনাথ জাদুঘরে রাখা আছে। একসময়ে সম্রাট অশোক যুদ্ধ কবা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষের কাছে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর স্তম্ভটি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ কবা হয়েছে। সেটি ওলটানো পদ্বের মতো দেখতে একটি বেদির ওপর রাখা। তাব ওপর অশোকচক্র দেখা যায়। এই চক্রের বাঁদিকে ষাঁড় ও ডানদিকে ঘোড়ার মূর্তি।



সেদিন বাড়ি ফিরে পৃথার মনে খটকা লাগল। দাদু অশোককে রাজা না বলে সম্রাট বললেন কেন? তাহলে কী রাজা আর সম্রাট আলাদা? পবদিন ক্লাসে দিদিমণিকে সেই প্রশ্নই কবল পৃথা দিদিমণি বললেন, হ্যাঁ, রাজা আর সম্রাট আলাদা। এবারে তাহলে তোমাদের সম্রাট আর সাম্রাজ্যের কথা বলা যাক।

৬.১ সাম্রাজ্য কী? সম্রাট কে?

সহজ করে বললে, সাম্রাজ্য একটা বিরাট অঞ্চলকে বোঝায়। ধরা যাক, একটা রাজ্যে কয়েক হাজার জনগণ থাকে তাহলে একটা সাম্রাজ্যে কয়েক লক্ষ জনগণ থাকবে। অনেকগুলো রাজ্য জুড়ে একটা বড়ো শাসন এলাকা হয়। সেই বড়ো শাসন এলাকাটাই সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, তিনিই সম্রাট। সম্রাট মানে বড়ো রাজা। যে রাজা অনেক জনগণ ও অঞ্চলের শাসক তিনিই সম্রাট। তাঁর শাসন এলাকায় তাঁর কথাই শেষ কথা। তিনি রাজাদেবও রাজা। অর্থাৎ **রাজাধিরাজ** (রাজা+অধিরাজ)। তবে সম্রাট যদি মহিলা হন, তখন তাকে বলা হয় **সম্রাজ্ঞী**।

সাম্রাজ্য তৈরি হয় যুদ্ধ করে। ধরা যাক, একজন রাজা যুদ্ধ করে অন্য রাজাদেব হারিয়ে দিল। তারপর সব রাজ্যগুলো এক করে একটা বড়ো শাসন এলাকা তৈরি হলো। তাকেই সাম্রাজ্য বলা হয়। সেই জয়ী রাজা একটা বড়ো যজ্ঞ করে বিরাট উপাধি নিলেন। তখন তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কেউ থাকল না। তিনি হয়ে গেলেন সম্রাট। সবক্ষেত্রে যদিও রাজা যজ্ঞ করে সম্রাট হতেন না।

৬.২ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হলো কীভাবে?

ষোলটি মহাজনপদের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। এই এক একটা মহাজনপদ ছিল এক একটা রাজ্য। মগধ মহাজনপদে পরপর তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। সেইসব রাজাবা অন্যান্য মহাজনপদের বেশিরভাগকে নিজেদের দখলে আনেন। শেষপর্যন্ত মগধকে ঘিরেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হয়। তার নাম মৌর্য সাম্রাজ্য।



টুকায় বখা

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ নাগাদ হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিলেন গ্রিসের ম্যাসিডনের শাসক আলেকজান্ডার। উপমহাদেশের বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শাসকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে এলডার পোরোস বা রাজা পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ খুব বিখ্যাত। পুরুর রাজত্ব ছিল বিলাম ও চেনাব নদী দুটির মাঝের অঞ্চলে। বিবট সেনাবাহিনী নিয়ে পুর আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু গ্রিকবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত পুর হেবে যান। তবু তাঁর বীরত্বকে গ্রিকরা সম্মান জানিয়েছিল।

প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডার উপমহাদেশে ছিলেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ-এ তিনি বাহিনী সমেত ফিরে যান। পশ্চিম এশিয়া হয়ে গ্রিসে ফেরার পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডার এগিয়েছিলেন। গঙ্গা উপত্যকার দিকে তিনি এগোননি। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে উপমহাদেশের উত্তরে ছোটো ছোটো শক্তিগুলির ক্ষমতা কমে গিয়েছিল।



তার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দ নাগাদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সহজ হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক সহজেই মৌর্যদের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছবি ৬১:

আলেকজান্ডার ও
তাঁর প্রিয় ঘোড়া
বুকেফেলাস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা

উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় মগধের সিংহাসনে ছিলেন নন্দ বাজারা। এঁরা যদিও প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। চাণক্য নামের এক পণ্ডিত নন্দরাজাদের বোম্বের মুখে পড়েন। চাণক্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। শেষ নন্দবাজা ধননন্দ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে হেরে যান। এইভাবে মগধে মৌর্যদের শাসন শুরু হয়। নন্দদের সময়ে উত্তর ভারতে মগধের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে তোলেন। আলেকজান্ডারের সহকারী গ্রিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুদ্ধ করেন। সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রিকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সংঘাত বাধে। ঐ অঞ্চলের শাসক ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতি

সেলিউকাস নিকেটর। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে মিটে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একে অন্যকে নানান উপহার ও সুযোগ-সুবিধা দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫/৩২৪-৩০০ অব্দ)। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই।

টুকরো কথা

অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের শাসন পরিচালনার বিষয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়। রাজ্যশাসন কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা থাকত এই বইগুলিতে। তেমনই একটি বই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র। এর লেখক কৌটিল্য। অনেকে কৌটিল্য ও চাণক্যকে একই ব্যক্তি মনে করেন কিন্তু একথা এখন প্রমাণিত যে, কৌটিল্য ও চাণক্য আলাদা ব্যক্তি।

ঠিক কবে অর্থশাস্ত্র লেখা হয়, তা বলা মুশকিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ এই বইয়ের কিছু অংশ লেখা হয়েছিল তবে খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ অর্থশাস্ত্র লেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই চেহারা আজকে বইটি দেখা যায়। তাই একা কৌটিল্য এই বইটি বোধহয় লেখেননি তবে এর মূল বিষয়গুলো তাঁর লেখা বলেই তাঁর নামে বইটি পরিচিত। বইয়ের নামটি থেকে মনে হতে পারে যে, বইটি বোধহয় শুধু টাকাকড়ি নিয়ে লেখা। আসলে কিন্তু তা নয়। অর্থশাস্ত্রের মতে, রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে প্রধান হলেন রাজা। তাঁর কথাই শেষ কথা। এমনকি দরকারে রাজাকে ছল-চাতুরিও করতে হতে পারে। রাজকাজের সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা রয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বইটিতে শাসকের কী কী করা উচিত তাই বলা হয়েছে। যদিও তাব সব উপদেশই যে মৌর্য শাসকেরা মানতেন তেমন প্রমাণ নেই। মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জবুবি উপাদান অর্থশাস্ত্র।

মৌর্য সম্রাট অশোক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পবে তাঁর ছেলে বিন্দুসার সম্রাট হন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২৭৩ অব্দ)। বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বিশেষ বাড়েনি। বিন্দুসারের ছেলে অশোক প্রায় চার দশক শাসন করেন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ)। গোড়ার দিকে নাকি অশোক খুব নিষ্ঠুর ছিলেন বলে জানা যায়।

১১১

ভেবে দেখো

অর্থশাস্ত্র বইটি একজন ব্যক্তির লেখা নয়। তেমনি তোমাদের জানা আর কোন কোন বইয়ের লেখক একজন নন? এইরকমভাবে অনেকে মিলে একটা বই লেখা হতো কেন বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজনে পৃষ্ঠা ১১৪-র টুকরো কথাটিও আলোচনার মধ্যে আনো।



৬.৩ মৌর্য শাসনের শেষ দিক, কুষাণ ও সাতবাহন শাসন

সম্রাট অশোক মারা যাওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। যোগ্য সম্রাটের অভাবে ছোটো বাজারা স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় নানান বিদেশি জাতি ভারতে আসতে থাকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে সবিয়ে রাজা হলেন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ।

মনে রেখো

মৌর্যদের পর মগধে শুরু হলো সুঙ্গদের শাসন। পুষ্যমিত্র এবং অগ্নিমিত্র ছিলেন সুঙ্গদের দুজন প্রধান শাসক। সুঙ্গদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মগধের শাসক হন কাণ্ধবা। চারজন কাণ্ধ শাসকের কথা জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে কাণ্ধদের শাসনও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

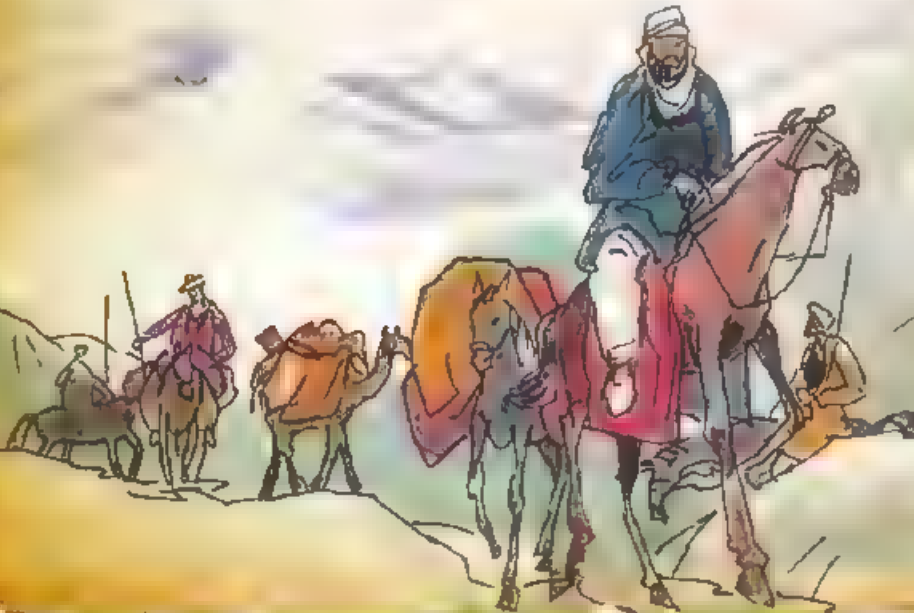
এই সময় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাজিনৈতিক অবস্থা বদলে যায়। ব্যাক্ত্রিয়ার গ্রিকবা ও শক-পহুবরা অনেক অঞ্চলে শাসন শুরু করে। যদিও কুষাণরাই শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল।

টুকুৰা কথা গঙ্গাৰিদাই

গ্ৰিক ও ৰোমান সাহিত্যে মগধৰ পূৰ্বদিকে এক শক্তিশালী ৰাজ্যৰ কথা পাওয়া গেছে। তাৰ নাম গঙ্গাৰিদাই বা গঙ্গাৰিদ (গঙ্গাহুদ)। এই ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ছিল গঙ্গা বা গ্যাঙ্গে বন্দব-নগৰ। তলেমিৰ মতে, গঙ্গানদীৰ পাঁচটি মুখ বা মোহনাব সবটাই জুড়ে ছিল গঙ্গাৰিদাই। নন্দৰাজাদেৰ আমলে এই ৰাজ্যৰ সঙ্গে মগধেৰ যোগাযোগেৰ কথা গ্ৰিক লেখকবা লিখেছেন। আলেকজান্ডাবেৰ আক্ৰমণেৰ সময় নাকি গঙ্গাৰিদাইয়েৰ সেনাবাহিনী মগধেৰ সেনাবাহিনীৰ সঙ্গে যুক্ত ছিল এই ৰাজ্যেৰ হস্তীবাহিনী ও যোদ্ধাদেৰ বীৰত্বেৰ কথা গ্ৰিক ও ৰোমান লেখকবা লিখেছেন। মনে হয় যে, গঙ্গাৰিদাই ৰাজ্যটিকেই পেরিপ্লাসেৰ লেখক গঙ্গাদেশ বলে উল্লেখ কৰেছেন। এই ৰাজ্যেৰ নামেৰ মধ্যেই গঙ্গানদীকে ঘিৰে তাৰ অবস্থান বোঝা যায়, চিনা সাহিত্য ও কালিদাসেৰ লেখাৰ তুলনা কৰলে আৰো একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো, গঙ্গাদেশ বা গঙ্গাৰিদাই ও বঙ্গেৰ অবস্থান একই জায়গায়। মগধ ও গঙ্গাৰিদাই দুটি ৰাজ্যই তাম্ৰলিঙেৰ বা তাম্ৰলিপ্ত ও গ্যাঙ্গে বন্দব দুটি ব্যৱহাৰ কৰত গ্ৰিক লেখক দিওদোৰাস-এৰ মতে, ভাৰতবৰ্ষে বহুজাতিৰ বাস। কিন্তু গঙ্গাৰিদাই জাতি সবাৰ সেৱা। প্ৰত্নতাত্ত্বিকবা তাম্ৰলিপ্ত বা তমলুক, চন্দ্ৰকেতুগড়, দেগঙ্গা প্ৰভৃতি স্থানে অনেক প্ৰত্ন-উপাদান পেয়েছেন। সেইসব উপাদানেৰ সঙ্গে গঙ্গাৰিদাই এৰ সম্পৰ্ক আছে বলে মনে কৰা হয়।

কুমাণ কাৰা ?

মধ্য এশিয়া থেকে কয়েকটি যাযাবৰ গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে চলে যায়। এৰা এখনকাৰ আফগানিস্তান ও ভাৰতীয় উপমহাদেশেৰ উত্তৰ-পশ্চিম অংশে পৌঁছোয়। এদেৰ মধ্যে ইউয়ে-ঝি গোষ্ঠীটি ছিল সবচেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই গোষ্ঠীৰ একটি শাখা ছিল কু এই যুমাং। তাৰা ব্যাকট্ৰিয়াৰ ওপৰ অধিকাৰ কায়েম কৰেছিল। এৰাই ভাৰতেৰ ইতিহাসে কুমাণ নামে পৰিচিত। ধীৰে ধীৰে কুমাণৰা এক বিৰাট সাম্ৰাজ্য তৈৰি কৰেছিলে





ছবি ৬.৪:
কুজুল কদফিসেসের
ভামার মুদ্রা



ছবি ৬.৫:
বিম কদফিসেসের
সোনার মুদ্রা



ছবি ৬.৬:
কনিষ্কের সোনার মুদ্রা



ছবি ৬.৭:
হুবিষ্কের সোনার মুদ্রা

কুশাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব ছিল কুজুল কদফিসেস-এর। কাবুল ও কাশ্মীর এলাকা তাঁর দখলে ছিল। তারপর শাসক হন কুজুলেব ছেলে বিম কদফিসেস। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে বিমের শাসন ছিল। বিবাত শক্তিশালী কুশাণ শাসক হিসাবে জমকালো উপাধি নিয়েছিলেন বিম। ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা তিনিই প্রথম চালু করেন।

বিমের ছেলে প্রথম কনিষ্ক কুশাণদের সেবা রাজা। অন্তত তেইশ বছর বাজত্ব করেন কনিষ্ক। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসক হন তিনি সেই বছর থেকে শকাব্দ গণনা শুরু হয়। কনিষ্কের আমলে কুশাণ শাসন গঙ্গা উপত্যকার বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনকার পাকিস্তানের প্রায় পুরো অঞ্চলটাই কুশাণ শাসনের আওতায় ছিল। মথুরা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে কুশাণ শাসন ছড়িয়ে পড়ে। কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশাওয়ার। তবে, কুশাণদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশ।

প্রথম কনিষ্কের পরে বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক শাসক হন। আস্তে আস্তে কুশাণ শাসনের অবনতি দেখা দেয়। একসময় ব্যাকট্রিয়াও কুশাণদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ২৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে কুশাণ শাসকদের কথা বিশেষ জানা যায় না।

টুকায় বখা

কলিঙ্গরাজ খারবেল: হাতিগুম্ফা শিলালেখ

মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মৌর্যদের পরে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়ে যায়। চেরি বংশের শাসকরা কলিঙ্গে শাসন শুরু করেন। ঐ বংশের শাসক খারবেল কলিঙ্গের প্রথম শক্তিশালী রাজা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে খারবেলের শাসন ছিল। হাতিগুম্ফা শিলালেখ থেকে খারবেলের বিষয়ে জানা যায়। ঐ শিলালেখতে ভাবতবর্ষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে সেখানে ভাবতবর্ষ বলতে সম্ভবত গঙ্গা উপত্যকার একটা অংশ বোঝানো হয়েছিল। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকেই চেরিদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন শাসন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে দক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল। ঐ সময় দক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও গুজরাট এলাকায় ছিল শকদের শাসন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শেষ হয়ে যায়।

টুকায় বখা

এলাহাবাদ প্রশস্তি

এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে একটি শিলালেখ আছে। লেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা। এলাহাবাদের কৌশাম্বী গ্রামে লেখটি ছিল। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর সেটিকে তুলে আনিয়ে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রাখেন। ঐ লেখটিতে প্রশস্তি খোদাই করা আছে। প্রশস্তিটি হরিষেণের লেখা তিনি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন লেখটিতে আদতে সমুদ্রগুপ্তের গুণগান করা হয়েছে। সম্রাট হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধ, রাজ্যের প্রভুত্ব কথা লেখটিতে আছে পদ্য ও গদ্য দু-ভাষাতেই সেটি লেখা। যদিও সমুদ্রগুপ্তের প্রসঙ্গে শুধু ভালো কথাই লেখটিতে বলা হয়েছে। তবুও ওই সময়ের ইতিহাস জানার জন্য লেখটি জবুবি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

সুদূর দক্ষিণে তামিলনাড়ুর উত্তর-পূর্ব অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসকের অধিকার কায়েম হয়েছিল। তবে দক্ষিণ ভারতে বাবো জন রাজাকে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব ফিরিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। উত্তর ভাবত থেকে দক্ষিণ ভাবতে শাসন টিকিয়ে রাখা সম্রাটের পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না। সে সময়ের কয়েকটি রাজশক্তি সমুদ্রগুপ্তকে কব দিত। তাদের বলা হতো কবদ রাজ্য।

সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ (৫৬ গুপ্তাব্দ) নাগাদ শাসক হন। গুজবাট অঞ্চল থেকে শক-ক্ষত্রপ শাসকদের উচ্ছেদ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাই তাঁকে বলা হয় **শকাবি** (শক + অবি (শত্রু) = শকাবি)। তাঁব আমলেই প্রথম বুপোব মুদ্রা চালু হয়। সম্ভবত শকদেব হারিয়ে দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ৪১০-৪১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঐ বুপোর মুদ্রা চালু করা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৪-৪৫৪/৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁব শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও ক্ষমতা আগের মতোই ছিল। তিনি সাম্রাজ্যে নানারকম মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁব সময়েই নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের ছেলে স্কন্দগুপ্ত এরপর সম্রাট হন। আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে হুণরা আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত সফলভাবে সেই আক্রমণ বুখে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত শেষ গুপ্ত সম্রাট যাঁব শাসন এলাকা ছিল বিবাট। তাঁব পব থেকেই গুপ্তদেব শক্তি কমতে থাকে। ছোটো ছোটো স্থানীয় শাসকরা গুপ্ত শাসকদের অমান্য কবতে থাকে। ফলে উত্তর ভারতে বেশ কিছু আঞ্চলিক শাসন দেখা দেয়।

দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন

উত্তর ভারতে গুপ্ত শাসনের সময়েই দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাকাটক শক্তি দাক্ষিণাত্যে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সাতবাহন শাসন ততদিনে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের বড়ো এলাকা জুড়ে বাকাটক শাসন ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেয়ে প্রভাবতীগুপ্তার বিয়ে হয়েছিল বাকাটক-বাজা দ্বিতীয় বুদ্ধসেনের সঙ্গে। তার ফলে দাক্ষিণাত্যেও গুপ্ত শাসনের প্রভাব তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বুদ্ধসেন মারা যাওয়ার পর প্রভাবতীগুপ্তাই বাকাটক শাসন চালিয়েছিলেন।

অস্ট্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ক্রমশই পল্লবদের শক্তি বাড়ছিল। আনুমানিক সপ্তম শতকেব গোডাব দিকে দক্ষিণ ভাবতে চালুক্য ও পল্লববাই হয়ে উঠেছিল প্রধান শক্তি। মনে রেখো, দক্ষিণের পল্লবরা কিন্তু পল্লব বা পার্থীদেব থেকে আলাদা।



ছবি ৬.৮:

সমুদ্রগুপ্তের সোনার মুদ্রা



ছবি ৬.৯:

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
সোনার মুদ্রা



ছবি ৬.১০:

কুমারগুপ্তের সোনার মুদ্রা



ছবি ৬.১১:

স্কন্দগুপ্তের সোনার মুদ্রা

জন্য বড়ো বড়ো যজ্ঞ কবেছিলেন। কুষাণদের মতোই গুপ্ত সম্রাটরাও নিজেদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেন।

সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন রাজকর্মচারীরা। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে বিভিন্ন পদ ও মর্যাদার রাজকর্মচারী ছিল। অমাত্য বা সচিব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী। গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হতো ভুক্তি, যেমন মগধভুক্তি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে ভুক্তির বদলে দেশ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রদেশের শাসনভার থাকত গুপ্ত রাজপুত্রদের হাতে। বাকাটক শাসনে প্রদেশগুলি রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। রাজ্যের শাসকদের বলা হতো সেনাপতি।

প্রদেশের থেকে ছোটো জেলা অঞ্চলগুলো গুপ্ত শাসনে বিষয় নামে পরিচিত হতো। বাকাটক শাসনে বিষয় শব্দের বদলে জেলা অঞ্চলগুলোকে বলা হতো পট্ট বা আহার। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটা বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা ছিল। জেলা ও গ্রামস্তরের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা জনপ্রতিনিধির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসনে যুবরাজ ও বানিদেবও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে গুপ্ত শাসনের শেষ দিকে সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৬.৫ গুপ্তদের পর উত্তর ভারতের অবস্থা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুপ্তদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকল। একসময় গুপ্ত সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। আর তার জায়গা নিল ছোটো ছোটো রাজ্য। একেকটা অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই রাজ্যগুলিকে বলা হতো আঞ্চলিক রাজ্য।

পুষ্যভূতিদের রাজ্য : হর্ষবর্ধনের শাসন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বড়ো সাম্রাজ্য দেখা যায়নি। পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গোড়ায় পুষ্যভূতি বা থানেসর বা স্থানীশ্বরের শাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে পুষ্যভূতিদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রভাকরবর্ধন মারা যান। তখন তাঁর বড়ো ছেলে রাজাবর্ধন শাসনের দায়িত্ব পান।

এদিকে কনৌজ মালব দ্বন্দ্ব কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা মারা যান। তাঁর সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের মেয়ে রাজ্যস্রী বিয়ে হয়েছিল। রাজ্যবর্ধন তখন মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়ের রাজা

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

- ১.১) সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে চিবকাল শত্রুতা ছিল।
- ১.২) মৌর্য আমলে মেয়েরাও মহামাতোর দায়িত্ব পেতেন।
- ১.৩) কুষাণরা এদেশেরই মানুষ ছিলেন।
- ১.৪) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ গোনা চালু করেন

২। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :

২.১) বিবৃতি অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে পশুহত্যা বন্ধ কবেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁর রাজ্যে পশুব সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- ধর্মের অনুসরণ করার জন্য।

ব্যাখ্যা : ৩- পশুবাণিজ্য বাড়ানোর জন্য।

২.২) বিবৃতি কুষাণ সম্রাটরা নিজেদের মূর্তি দেবকূলে রাখতেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁরা ছিলেন দেবতার বংশধর

ব্যাখ্যা : ২- তাঁরা প্রজাদের সামনে নিজেদের দেবতার মতোই সম্মাননীয় বলে হাজির করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- তাঁরা দেবতাকে খুব ভক্তি করতেন।

২.৩) বিবৃতি : গুপ্ত সম্রাটরা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন।

ব্যাখ্যা : ১- উপাধিগুলি শূন্যে ভালো লাগত।

ব্যাখ্যা : ২- উপাধিগুলি প্রজারা দিত।

ব্যাখ্যা : ৩- সম্রাটরা এম মাধ্যমে নিজেদের বিরাট ক্ষমতাকে তুলে ধরতেন।

২.৪) বিবৃতি : সুয়ান জাং চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন

ব্যাখ্যা : ১- ভারতীয় উপমহাদেশে বেড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- হর্ষবর্ধনের শাসন বিষয়ে বই লেখার জন্য

ব্যাখ্যা : ৩- বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার জন্য।

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) কলিঙ্গ যুদ্ধে ফলাফলের সঙ্গে অশোকের ধর্মের কী সম্পর্ক? ধর্ম তাঁর শাসনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৩.২) মৌর্য সম্রাটরা গুপ্তচর কেন নিয়োগ করতেন?

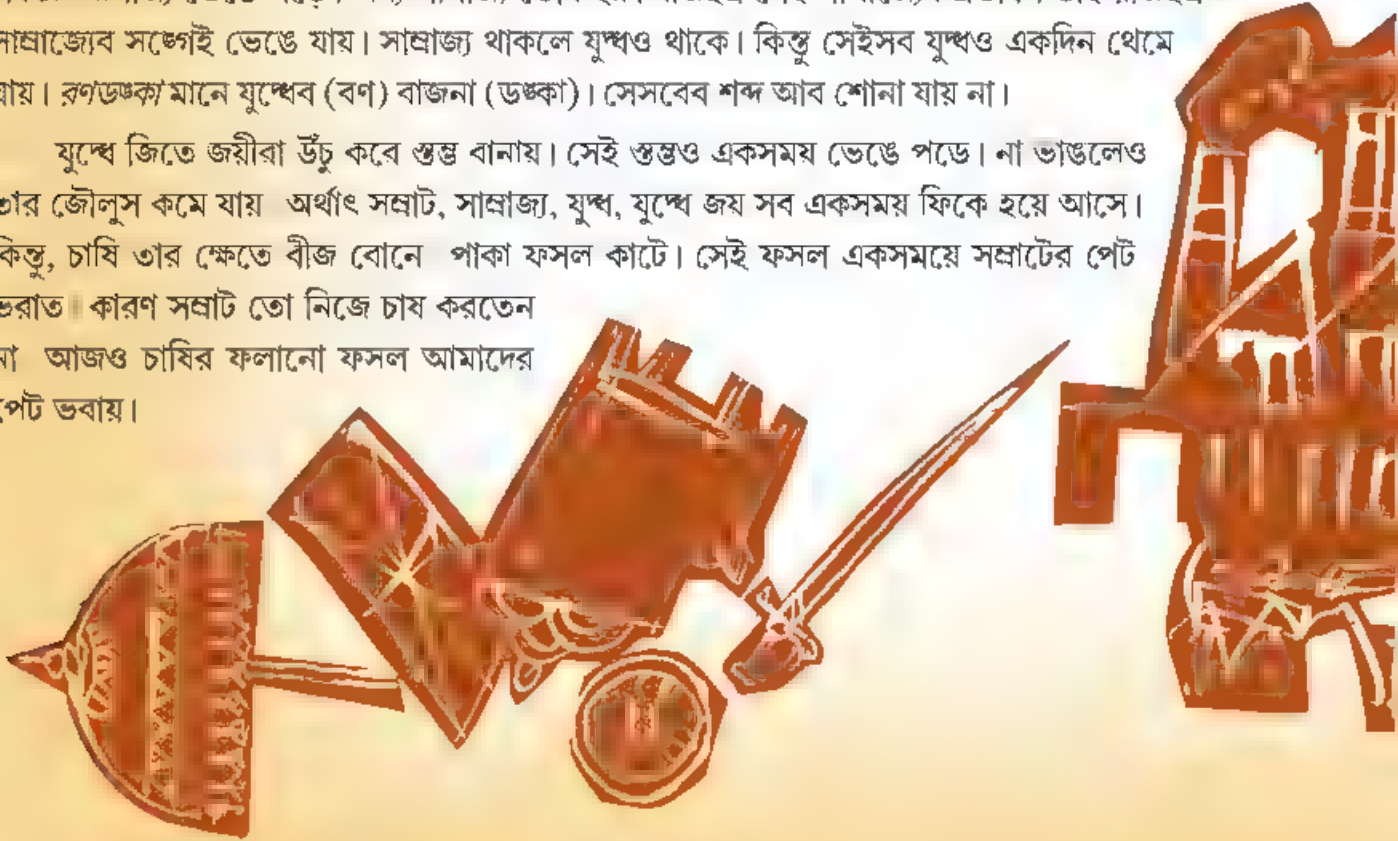
৩.৩) মৌর্য সম্রাট ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা করো

৪। হাতেকলমে করো :

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের মুদ্রাগুলির তুলনা করলে কী কী মিল-অমিল দেখা যাবে?

রাজা সম্রাটদের কথা শুনতে ভালো লাগে তবে খালি বাজাদের কাজকর্মের কথাই শুনতে ভালো লাগে না বুঝির। দাদুকে তাই পাকড়াও করল সবাই। আজ ওদের সবাইকে গল্প শোনাতে হবে। তবে বাজার বা রূপকথার গল্প নয় এমনি লোকজনের গল্প। দাদু বললেন, বেশ তাই হোক বলেই সটান বসে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলেন। ওরা চিরকাল/ টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল / ওরা মাঠে মাঠে/ বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।/ ওরা কাজ করে/ নগরে প্রান্তরে। দাদুর মুখে আবৃত্তি শুনছে সবাই। আবার বললেন দাদু, রাজহুত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,/ জয়স্তুস্ত মুঢ়সম অর্থ তার ভোলে, —ওমা হঠাৎ গল্পের কথায় কবিতা চলে এল। এর মানে কী? দাদু বুঝিয়ে বললেন, এই কবিতায় ওরা মানে সাধারণ মানুষ। তারা চিরদিনই নিজের নিজের কাজ করে যায়। ক্ষেতে ফসল ফলায়। নৌকা চালায় নদীতে। নগর বা গ্রাম সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের কাজকাববাব চলতে থাকে কিন্তু সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকে না একজন শাসক হয়। বেশ কিছু বছর তাব শাসন চলে। তাবপব অন্যজন শাসক হয়ে বসে। একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অন্য সাম্রাজ্য তৈরি হয়। রাজহুত্র সেই সাম্রাজ্যের প্রতীক। তাই রাজহুত্র সাম্রাজ্যের সঙ্গেই ভেঙে যায়। সাম্রাজ্য থাকলে যুদ্ধও থাকে। কিন্তু সেইসব যুদ্ধও একদিন থেমে যায়। রণডঙ্কা মানে যুদ্ধের (রণ) বাজনা (ডঙ্কা)। সেসবের শব্দ আর শোনা যায় না।

যুদ্ধে জিতে জয়ীরা উঁচু করে স্তম্ভ বানায়। সেই স্তম্ভও একসময় ভেঙে পড়ে। না ভাঙলেও তার জৌলুস কমে যায় অর্থাৎ সম্রাট, সাম্রাজ্য, যুদ্ধ, যুদ্ধে জয় সব একসময় ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু, চাষি তার ক্ষেতে বীজ বোনে পাকা ফসল কাটে। সেই ফসল একসময়ে সম্রাটের পেট ভরাত কারণ সম্রাট তো নিজে চাষ করতেন না আজও চাষির ফলানো ফসল আমাদের পেট ভবায়।



এই বলে দাদু ফেব আবৃত্তি করলেন শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ— 'পবে/ওরা কাজ কবে।/—শেষে বললেন, আজ সম্রাটও নেই, সাম্রাজ্যও নেই। কিন্তু চাষি আছে, কবিগব শিল্পীবা আছে এবাই সমাজ চালায়। এবাই খাদ্য উৎপাদন কবে আমাদের বোজকাব প্রয়োজন মেটায়। আমবা সবাই এই 'ওবা'-ব ভিতবে পডি আমবা সাধাবণ মানুষ। কিন্তু আমাদের সবাব নাম বিখ্যাত নয়। বাজা সম্রাটদের নাম অনেকেই জানে কিন্তু সম্রাট অশোকের বখ চালাতেন কে? তাব নাম কেউ জানে না। এসব শুনে অবুণ বলল, সতি এটা ভাবি অন্যায়। বাজাদের কথা কত ফলাও কবে বলা হয় কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা হয় না তাদের নামও আমরা জানতে পাবি না। তখন সবাই মিলে ঠিক কবল স্কুলে গিয়ে স্যাবকে বলবে এসব।

পরদিন স্যার সব শুনলেন। বললেন, এবারে তাহলে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের কথাই আলোচনা হোক। সাধারণ মানুষকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। তাদের কাজকর্মের ফলেই সম্পদ তৈরি হয়। সেই সম্পদে চলত রাজার, সম্রাটের শাসন। এবারে তাহলে সেই সমাজ, অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের কথাই শুরু হোক তোমরা তো খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ যোলোটা মহাজনপদের কথা জেনেছ। ঐ সময় থেকেই শুরু কবা যাক

৭.১ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক : ষোড়শ মহাজনপদের আমল

মহাজনপদগুলির আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি ও সমাজও বদলে গিয়েছিল। জনপদ বলতে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায়। ফলে জনপদ ও মহাজনপদে কৃষিজীবী জনবসতিও ছিল। মহাজনপদগুলিতে রাজকর্মচারী ও যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ কৃষি থেকেই আসত। বেশিরভাগ মহাজনপদ গঙ্গা উপত্যকায় ছিল। ঐ অঞ্চলের নদীগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই জল থাকত। তার সঙ্গে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি। এর ফলে ঐ অঞ্চলের উর্বর মাটি চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

কৃষিকাজ ছিল সেই সময়ের প্রধান জীবিকা। সেযুগের বিভিন্ন লেখায় চাষের কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। উর্বরতা অনুযায়ী জমির নানাবকম ভাগ কবা হতো। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলানো হতো। ঋতু অনুযায়ী ফসলগুলির আলাদা আলাদা নামও ছিল। কৃষিতে ধানই ছিল প্রধান ফসল। ধানের মধ্যে সেবা ছিল শালি ধান। মগধ অঞ্চলে শালি ধানের চাষ বেশি ছিল। কৃষিজ ফসলের মধ্যে গম, যব ও আখের ফলনও হতো।

আগের মতো জমির উপর সবাব সমান অধিকার আর ছিল না। কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অনেক জমির অধিকার ছিল। এর পাশাপাশি ছিল জমিহীন কৃষক। কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও হতো। কৃষির জন্য গবাদি পশুর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পব থেকে গবাদি পশু বলি দেওয়া কমতে থাকে।



টুকরা বখা

উত্তর ভারতের
কালো চকচকে
মাটির পাত্র

গৌতম বুদ্ধের সময়ে একবকম মাটির পাত্র বানানোর শিল্প খুব উন্নত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা যোগুলিকে উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র বলেন এই পাত্রগুলি আগেব আমলের ধূসর মাটির পাত্রগুলির থেকেও উন্নত। খুব ভালো মানের মাটি দিয়ে এই পাত্রগুলি তৈরি হতো। কুমোবের চাকার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এই পাত্র বানানো সহজ হয়। পাত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলি আয়নার মতো চকচকে মাটির পাত্রগুলিকে ভালো চুল্লির আঁচে পুড়িয়ে কালো করা হতো। পোড়ানোর পর পাত্রগুলি পালিশ করা হতো। এই মাটির পাত্রের নজির হিসাবে থালা ও নানা বকমের বাটি পাওয়া গেছে।

এই সময়ে কাবিগবি শিল্প ও নানাবকম পেশার বিবরণও পাওয়া যায়। এই সময়েব লোহার জিনিসপত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। তাছাড়া দা, কুড়ুল, কুঠার ও কিছু লাঙলের ফলাও পাওয়া গেছে। লোহার কুড়ুল ও কুঠার দিয়ে সহজেই ঘন জঙ্গল কাটা যেত। তার ফলে বসতি ও কৃষি জমি বাড়ানো সহজ হয়। মহাজনপদগুলি যুদ্ধের কাজে লোহার অস্ত্রের ব্যবহার করতো। মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আকরিক লোহা পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতে লোহার জিনিসপত্র কৃষিকাজে ব্যবহার হতো। তবে লোহার তৈরি লাঙলের ফলার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে এই সময় হয়নি। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিল বাবাণসী। গয়না বানানোর শিল্পও এইসময় লক্ষ করা যায়। দামি ও আধাদামি নানাবকম পাথর ও পুঁতিব গয়না বানানোর কাজে ব্যবহার হতো।

কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি বাণিজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। এই সময়ে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ধনী বণিকদের পাশাপাশি ছোটো দোকানদার ও ব্যবসায়ীও ছিল। অনেক গোরুরগাড়ি বোঝাই করে দূরদূরান্তে বাণিজ্য যেতেন কিছু বণিক। গোরু ও ঘোড়ার বাণিজ্য চলত। উত্তর ভারতে স্থলপথে ও নদীপথে বাণিজ্য করা সহজ ছিল। সেই তুলনায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য হতো কম। ব্যবসা করতে গেলে ধার দেওয়া-নেওয়া ছিল জরুরি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তাব জন্য ছাড় দেওয়াও হয়েছিল। তবে ধার নিয়ে তা শোধ দেওয়া উচিত বলে মনে করা হতো। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এই সময় ধাতুব মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। কার্ষাপণ ছিল বহু প্রচলিত এক ধরনের মুদ্রা। গোল ও চৌকো আকৃতির অনেক রূপের মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ থেকে বোঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যও এইসময় বেড়েছিল। তবে বিন্দ্য পর্বতের দক্ষিণে এই সময়ের মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম নগর দেখা গিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায়। তাই তাকে বলে প্রথম নগরায়ণ। তার প্রায় হাজার বছরেরও পরে আবার নগর গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই নগরায়ণ মূলত হয়েছিল উত্তর ভারতে বিশেষত গঙ্গা উপত্যকায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ হওয়া এই নগরায়ণ দ্বিতীয় নগরায়ণ বলে পরিচিত। সেযুগের লেখায় গ্রাম ও নগরের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বেশিরভাগ মহাজনপদের রাজধানীগুলিই ছিল বিখ্যাত নগর। নগরগুলি ছিল পাথর, মাটি বা ইট দিয়ে বানানো প্রাকার দিয়ে ঘেঁরা।

নগরগুলি গ্রামীণ বসতির তুলনায় আকারে বড়ো ছিল। শাসন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা প্রধানত নগরে থাকত। এরা কেউই নিজেরা নিজেদের

খাদ্য উৎপাদন করত না ফলে এদের জন্য নিয়মিত খাদ্য আসত গ্রাম থেকে। তাই নগরগুলো গড়ে উঠত গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি। নতুন নগর তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছু নতুন জীবিকারও খোঁজ পাওয়া যায়। এই সময় উত্তর ভাবে ধোপা, নাপিত ও চিকিৎসকের (বৈদ্য) জীবিকা খুব পরিচিত ছিল।

পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের পাবে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই কমে গিয়েছিল। বালিকা বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সমাজে বেড়ে যায়। তবে নারীদের প্রতি বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় কিছুটা উদার ছিল।

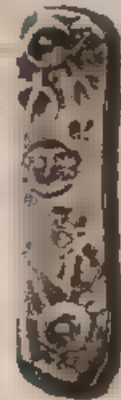
৭.২ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ : মৌর্য আমল

মৌর্য আমলেও সমাজে ধনী ও দরিদ্র এবং অন্যান্য ভেদাভেদ ছিল। নারীদের সাধারণ অবস্থা মৌর্য আমলেও আগের মতো ছিল। তবে ঘরকন্নার কাজের বাইরেও নারীরা কয়েকটি পেশায় যোগদান করতে পাবতেন। সুতো উৎপাদনের কাজে নারী শ্রমিকদের কথা জানা যায় গুপ্তচর ও বাজকর্মচারী হিসাবেও নারীদের নিয়োগ করা হতো।

মৌর্য আমলেও অর্থনীতি মূলত কৃষির উপবেই নির্ভর করত। বহু নদী থাকার জন্য ও বছরে অন্তত দু'বার বর্ষার ফলে জমি উর্বর থাকত। নানাবকম ও পরিমাণে অনেক ফসলের কথা জানা যায়। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবাদি এলাকা বাড়ানোর দিকেও সেযুগে নজর দেওয়া হতো।

কারিগর ও বণিকদের কাজের তদারকি করত রাষ্ট্র। খনি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার ছিল একচেটিয়া। খনিগুলির দেখভালের জন্য বাজকর্মচারী বহাল করা হতো। নুনকেও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ধরা হতো। সুতো ও মুদ্রা তৈরির শিল্পেও রাষ্ট্রের তদারকি চলত। তবে সবক্ষেত্রে এই তদারকি একই রকম ছিল না।

ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য আলাদা রাজকর্মচারী থাকত। মৌর্য আমলে রাজধানীর সঙ্গে সাম্রাজ্যের নানা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল। নিয়মিত রাজপথের দেখাশোনা করার জন্য রাজকর্মচারী থাকত। পথের পাশে দূরত্ব ও দিক বোঝানোর ফলক লাগানো হতো। সেগুলি ছিল অনেকটা আজকের মাইল ফলকের মতো।



ছবি. ৭.১:

প্রাচীন ভারতীয়
উপমহাদেশের
নারীবকম মুদ্রা

টুকরো কথা

মেগাস্থিনিসের চোখে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

মেগাস্থিনিস ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজের চারটি বর্ণের কথা জানতেন না তবে পেশাদার বা বৃত্তিজীবী নানা জাতি তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের জনসমাজ সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। যেমন— ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক ও শিকারি, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, গুপ্তচর বা পর্যটক এবং সচিব বা মন্ত্রী। মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ছিল না।

মেগাস্থিনিসের মতে, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা নগরে বাস করত না তারা কখনও অন্য কোনো জাতিকে আক্রমণ করে না অপব জাতিবাও ভারতবাসীদের আক্রমণ করত না। আলেকজান্ডারই একমাত্র যিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মেগাস্থিনিসের মতে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। তবে মেগাস্থিনিসের সব কথাগুলি কিছু ঠিক নয়।

১১১

ভেবে দেখো

বৈদিক সমাজের সঙ্গে
মৌর্য আমলের সমাজের
কী কী মিল ও অমিল
খুঁজে পাওয়া যায়?

মৌর্য আমলে সাধারণ পুরুষেরা অনেকটা আজকের ধুতি চাদরের মতো পোশাক পরতেন। মহিলারা পোশাকের উপর চাদর বা ওড়না ব্যবহার করতেন। ধনী ও রাজপরিবারের নারী-পুরুষ দামি পোশাক পরতেন। সুতির কাপড়ের চাহিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল পশম ও রেশমের কাপড়ের ব্যবহার ছিল বলেও জানা যায়। পুরুষেরা অনেকেই মাথায় পাগড়ি পরতেন। দামি পাথর ও সোনার তৈরি গয়না পরতেন ধনীরা।

মাটি, পাথর, ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি হতো ঘরবাড়ি। ঘরের ভিতরে ও বাইরে পলস্তারা লাগানো হতো। অনেকে ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকাতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে খাট বা চৌকি, মাদুর, তোশক, চাদর, বালিশ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

৭.৩ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত : কুমাণ আমল

অর্থনীতি ও সমাজের নিরিখে এই পাঁচশো বছরে বেশ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল এই সময়। উত্তর ভারতে আগের মতো কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান, গম, যব, আখ, কার্পাস ছিল প্রধান ফসল দক্ষিণাত্যের কালোমাটিতে তুলোর চাষ বেশি হতো। কেবালায় গোলমরিচের ফলন ছিল বিখ্যাত। কৃষিকাজে নানান রকমের উপকরণের

রেশম ছিল আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। কাচের তৈরি জিনিসপত্রও বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। এই আমলে কারিগরি শিল্প ও পেশার বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছিল। বারাণসী ও মথুরা দামি কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড় মসলিনের কদর ছিল।

টুকায় বন্ধা

নতুন নতুন নগর

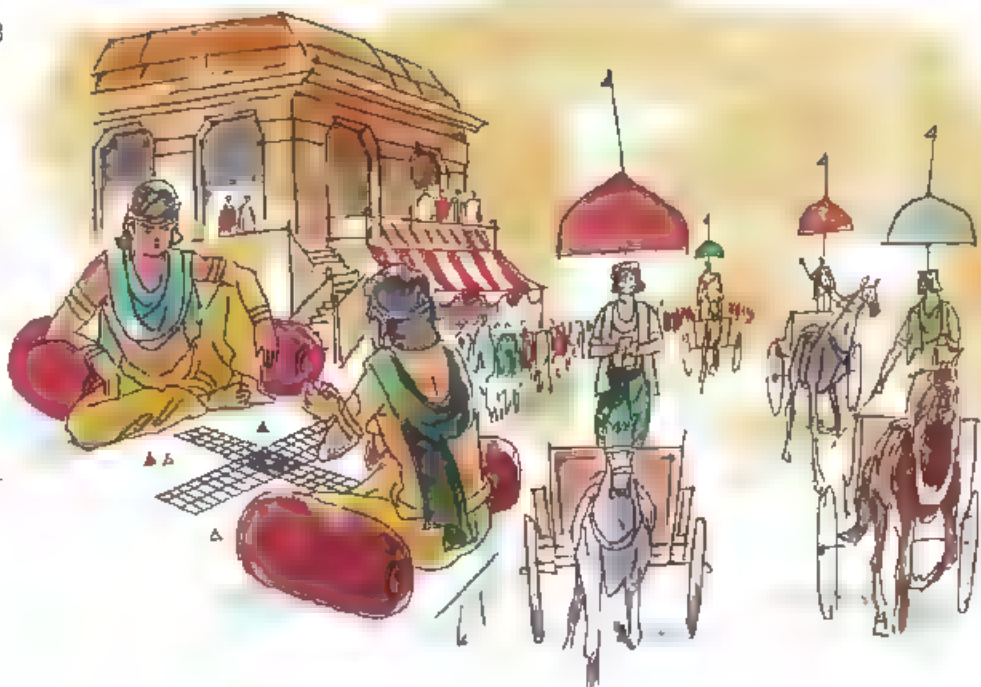
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রধানত উত্তর ভারতে নগরায়ণ দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে এই আমলে প্রায় পুরো উপমহাদেশ জুড়ে নতুন নগর গড়ে ওঠে। তক্ষশিলার সিবকাপ-এ প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে একটি নগরের খোঁজ পেয়েছেন। তাব থেকে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নগরগুলি বেশ উন্নত ছিল। কুবাণ আমলে গঙ্গা যমুনা দোয়াবে প্রাকার ঘেঁষা মথুরা ছিল বিখ্যাত নগর। এই নগরে কাদমাটির ইট ও পোড়ানো ইটের ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় মথুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মথুরার ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প ছিল বিখ্যাত।

মৌর্য আমলে প্রাচীন বাংলাতে মহাস্থানগড় ও বাণগড়ে নগর ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে এইসময় তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি নগরও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ওড়িশা এলাকায় শিশুপালগড়ে নগরের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণাভা ও দক্ষিণ ভারতেও এই সময় নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে। কাবেরী নদীর বদ্বীপে কাবেরীপট্টনম ছিল বিখ্যাত বন্দর-নগর।

এই আমলে বর্ণাশ্রম ও চতুর্বাশ্রম প্রথা ছিল কঠোর। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার থেকে অনেক গোষ্ঠী এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। ধীরে ধীরে এদের অনেকেই ভারতীয় সমাজে মিশে যায়।

মৌর্য আমলের মতো এই সময়েও অবসর সময় কাটানোর নানান উপায় ছিল। নাচ, গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

পাশাপাশি জাদুর খেলা ও নানান রকম দড়ির কসরত সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিত। পাশা খেলা, শিকার, রথের দৌড়, কুস্তি প্রভৃতি ছিল ধনী মানুষদের অবসর কাটানোর উপায়। বড়ো বড়ো উৎসবে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিনা পয়সায় খাবার ও পানীয় বিলি করা হতো।



টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয়
উপমহাদেশে
কারিগর

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে নানা বকম কারিগরি শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের বিকাশ হয়েছিল কারিগররা অনেক সময় একে কটা অঞ্চলে জমায়েত হয়ে বাস করতেন কুশাণ আমলে কারিগরি শিল্পের বৈচিত্র্য বেড়েছিল কুমোর, কামার, ছুতার ও তাঁতিরা কথা জানা যায় পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরও ছিল যেমন, সোনার গয়না বানাত সুবর্ণকার হাতিব দাঁতের জিনিসপত্র বানাত দস্তকার তাঁতিরা কাপড় বুনতো। কাপড় বং করত বস্ত্রকার পাশাপাশি সূচিশিল্পের কাজ করত সূচিকার

গুপ্ত আমলে বাংলায় পাওয়া তাম্রলেখগুলিতে জমি কেনাবেচা কথা জানা যায়। বহু ক্ষেত্রে একটি জমি প্রথমে কেনা হতো। তারপরে ঐ জমি ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধবিহারকে দান করা হতো। ঐ দান করা জমিগুলি সাধারণত করের আওতায় পড়ত না। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঐ জমিদানকে অগ্রহাণ ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা আরো বেড়েছিল। দান পাওয়া জমিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। ঐ জমির উৎপাদন থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খরচা চালাতেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা। অনেক অনাবাদি জমিকে দান হিসেবে দেওয়া হতো। সেই জমিগুলিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। তার ফলে সেগুলি আবাদি জমি হয়ে উঠত। অর্থাৎ অগ্রহাণ ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজ বেড়েছিল।

এই সময়ে লোহার জিনিস তৈরির শিল্প খুব উন্নত ছিল। দিল্লির কুতুব মিনারের পাশে একটা লোহার স্তম্ভ আছে। সেটা খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে তৈরি। অথচ আজও সেটাতে মবচে পড়েনি। তাছাড়া এই আমলে লেখক বা কবিতা ও চিকিৎসক পেশার কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে দূরপাল্লাব বৈদেশিক বাণিজ্যে খানিক ঘাটতি দেখা যায়। এব একটা কাণ ছিল হুণ আক্রমণ (এই বিষয়ে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। এব ফলে বোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তবে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে উপমহাদেশের বাণিজ্য জারি ছিল। পূর্ব উপকূলের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি এই সময়ে আরো বাড়ি। তাম্রলিপ্তুর কাবেবীপট্টনম বন্দবেও নিয়মিত দূরপাল্লাব বাণিজ্য হতো।

টুকরো কথা

কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সংঘ। সংঘগুলি কারিগরি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মেটাত। তাছাড়া পেশাগত নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখত সংঘগুলি। জিনিসের গুণমান ও দাম ঠিক রাখাও সংঘের কাজের আওতায় পড়ত। সংঘগুলি শ্রেণি, গণ ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল।

কুশাণ যুগে এক একটি পেশাকে কেন্দ্র করে আলাদা গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিজস্ব আইন মোতাবেক চলত। তবে গুরুতর গোলমাল দেখা দিলে রাজা বা সম্রাটরা ব্যবস্থা নিতেন। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিয়মিতভাবে

নগর অর্থের লেনদেন করত সমাজের বিভিন্ন মানুষ সেখানে আমানত অর্থ জমা রাখত। নগর অর্থ ছাড়াও জমি, গাছ ইত্যাদি স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা হতো সেই জমা আমানতের উপর সুদও দেওয়া হতো। ঐ আমানত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে মূলধন হিসেবে দেওয়া হতো। এইভাবে শ্রেণি বা সংঘগুলি এক ধরনের ব্যাংকের মতোই কাজ করত। নর্মদা নদীর উত্তরের হিবেব খনি নিয়ে কুমাণ, সাতবাহন এবং শক ক্ষত্রপদের মধ্যে লড়াই চলেছিল।

গুপ্ত ও তার পরবর্তী আমলে সংঘগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছিল। শ্রেণির কাজকর্মের তদারকির জন্য বেশকিছু কর্মচারী বহাল করার তথ্য পাওয়া যায় নগরের নানা শাসনকাজেও ধনী বণিকদের ভূমিকা বাড়তে থাকে, এই আমলে বণিকরাও কারিগরদের মতো সংঘ বানাতে শুরু করেন। বণিকদের নিজস্ব সংগঠনকে বণিকগ্রাম বলা হতো।

গুপ্ত আমলে অনেক সোনার ও রূপের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজাদের চালু করা সোনার মুদ্রাকে *দীনার* ও *সুবর্ণ* বলা হতো। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে রূপের মুদ্রা প্রথম চালু করা হয়। তার নাম ছিল *রূপক*। সোনার ও রূপের মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে বেশি ব্যবহার হতো। রাজকার কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য তামার মুদ্রাও চালু করেন গুপ্ত শাসকরা। তবে গুপ্তদের সময়েই দক্ষিণের বাকাটক শাসকরা কোনো মুদ্রা চালু করেননি। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় মুদ্রার লেনদেন সমান ছিল না। তাছাড়া সমাজে কৃষিকাজ বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের হাব কমেছিল। এই সবার ফলে নগরগুলিও আগে থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজে বর্ণাশ্রম চালু ছিল। তবে সবাই কঠোরভাবে সেসব মানত না। কিন্তু নীচুতলার মানুষদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। একই অপবাদের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের আলাদা শাস্তি হতো। ধাব করলে শূদ্রকে অনেক চড়া হারে সুদ দিতে হতো। তবে এই আমলে শূদ্ররা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য করতে পারত। অবশ্য সবথেকে খাপাপ অবস্থা ছিল চন্ডালদের। তারা গ্রাম বা নগরের মধ্যে থাকতেও পারত না। এমনকি ব্রাহ্মণরা তাদের ছোঁয়াছুয়ি এড়িয়ে চলত।

এই আমলেও পরিবারের প্রধান ছিলেন বাবা। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার বীতি চালু ছিল। এই সময়ে অবশ্য মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেতেন। ঐ সম্পদের উপরে কেবল ঐ মেয়েরই অধিকার ছিল। একে *স্ত্রীধন* বলা হতো। মেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের ব্যবহার করতেন। তবে স্ত্রীধন প্রথা সমস্ত বর্ণের মধ্যে চালু ছিল না।



ছবি. ৭৩:

গুপ্ত আমলের বিভিন্ন মুদ্রা। এর মধ্যে একটিতে সমুদ্রগুপ্তের বীণা বাজানোর ছাপ রয়েছে। সেটি কোনটি?



টুকায় বন্ধা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের খাবার-দাবার

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে চাল, গম, যব ও শাকসবজি ছিল প্রধান খাবার। ধনীদেব মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে দুধ ও দুধের তৈরী নানান বকম খাবারের ব্যবহার ছিল। গরুর মানুষেরা ঘিয়েব বদলে তেল ব্যবহার করত। তাছাড়া মটর, তিল, মধু, গুড়, নুন প্রভৃতি খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে নিবামিষ খাওয়া দাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এমনকি সববকম মাছ খাওয়ার উপরেও বিধিনিষেধ ছিল। দুধ ও নানান বকম ফলের রস থেকে তৈরী পানীয়ের ব্যবহার ছিল।

টুকায় বন্ধা

ফাসিয়ান-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ফাসিয়ান চীন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখায় উপমহাদেশের মানুষ ও সমাজ বিষয়ে নানান কথা পাওয়া যায়। তবে তাঁর লেখায় কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলেননি তিনি। ফাসিয়ান লিখেছেন, উপমহাদেশে অনেকগুলি নগর ছিল। মধ্য দেশের নগরগুলি ছিল উন্নত। সেখানে জনগণ সুখে বাস করত। তবে চণ্ডালবা নগরের বাহিবে থাকত বলে তিনি জানিয়েছেন। যারা দুষ্টি প্রকৃতির লোক তাদেরকেই চণ্ডাল বলা হতো। এদেশের লোকেরা অতিথিদের যত্ন করত। বিদেশিদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তাব দিকেও তাবা খেয়াল রাখত। পাটলিপুত্র ছিল দেশের সেবা নগর। সেখানকার লোকেরা ছিল সুখী ও সম্পদশালী। ধনী বৈশ্যারা নগরের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। বিনামূল্যে সেখান থেকে ওষুধ দেওয়া হতো। গরীবদের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল।

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতবর্ষ ইন-তু নামে পরিচিত হয়েছে। তাঁর মতে ইন তু ব লোকেরা নিজেদের দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকে। দেশটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। ইন তু তে আশিটি রাজ্য আছে। প্রতিটি রাজ্যে নিজস্ব রাজা থাকলেও তাবা বড়ো সম্রাটের অনুগত ছিল।

সুয়ান জাং ইন-তুকে মূলত গরমের দেশ বলেছেন। সেখানে নিয়মিত বৃষ্টি হয়। উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। দক্ষিণ অঞ্চল বনে ঢাকা। পশ্চিম অঞ্চলের মাটি পাথুরে ও অনুর্বর। ধান ও গম প্রধান কৃষিজ ফসল। জনগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল।

শহরের বাড়িগুলি ইট ও টালি দিয়ে তৈরি হতো। বাড়ির বাবান্দা তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল ও মেঝে ছিল মাটির। নানান বকম দামি ধাতু ও পাথরের ব্যবসা চলত। শাসকরা জনগণের সুযোগ সুবিধের কথা মাথায় রাখতেন।

১১১

ভেবে দেখো

তোমরা সে আমলের খাবারের একটা তালিকা তৈরি করো। পাশাপাশি তোমরা এখন যেসব খাবার খাও তারও একটা তালিকা বানাও। সেই তালিকা দুটির তুলনা করো।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :

১.১) বিবৃতি : মৌর্য-পরবর্তীযুগে অনেকগুলি গিল্ড গড়ে উঠেছিল

ব্যাখ্যা : ১- রাজারা ব্যবসাবাগিজ্য বাড়ানোর জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন

ব্যাখ্যা : ২- কারিগর ও ব্যবসায়ীরা গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ৩- সাধারণ মানুষ টাকা লেনদেন ও গচ্ছিত রাখার জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

১.২) বিবৃতি : দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলোর চাষ হতো

ব্যাখ্যা : ১- দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি তুলো চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

ব্যাখ্যা : ২- দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কৃষক শুধু তুলোর চাষ করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- দাক্ষিণাত্যের মাটিতে অন্য কোনো ফসল হতো না

২। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১) জনপদ হলো ————— (কৃষিভিত্তিক/শিল্পভিত্তিক/শ্রমিকভিত্তিক) গ্রামীণ এলাকা।

২.২) মৌর্য আমলে অর্থনীতি মূলত ————— (শিল্পের/কৃষির/ব্যবসাবাগিজের) উপরে নির্ভর করত।

২.৩) গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদানকে বলা হয় ————— (সামন্ত/বেগাব, অগ্রহাব) ব্যবস্থা।

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) প্রথম নগরায়ণ (হরপ্পা) এবং দ্বিতীয় নগরায়ণ (মহাজনপদ) এর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে?

৩.২) প্রাচীন ভাষাতে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কেন? সেযুগের জলসেচ ব্যবস্থার সঙ্গে আজকের দিনের জলসেচ ব্যবস্থার কোন পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে কি?

৩.৩) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে কৃষির পদ্ধতি ও উৎপাদিত ফসলের মধ্যে কী কী তফাৎ দেখা যায়?

৪। হাতেকলমে করো :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে কোন কোন পেশার মানুষদের কথা তুমি জানতে পাবে, তাব তালিকা তৈরি করো। তার মধ্যে কোন কোন পেশা আজও দেখা যায়? বৈদিক সমাজে চালু জীবিকাগুলির সঙ্গে এইসময়ের পেশাগুলির কী কী মিল-অমিল দেখা যায়?

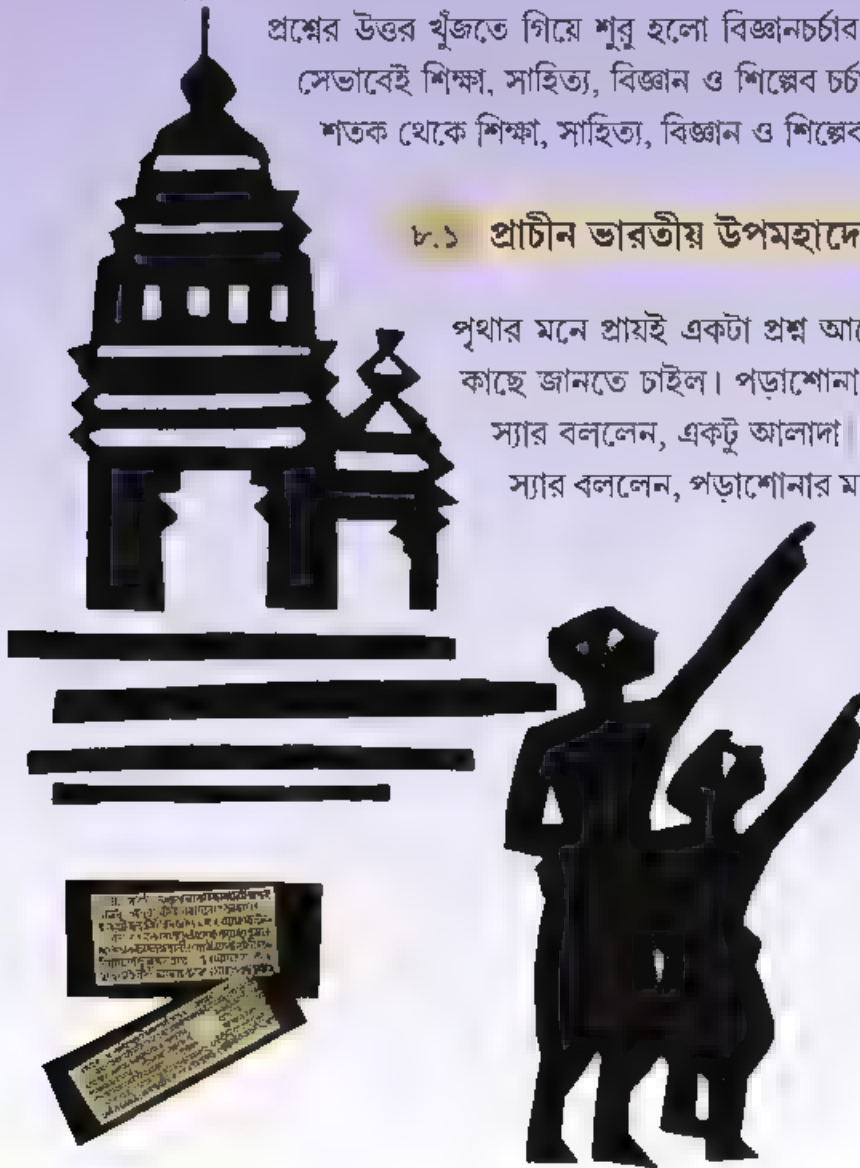
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প

স্যাব বললেন, তোমরাতো সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছ দেখেছো যে, শুধু খেয়ে পবে বেঁচে থাকতেই মানুষ খুশি ছিল না। নানা কিছু তৈরি করে চারপাশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলাব চেষ্টা করল তাবা গুছিয়ে ভালো ভাষায় নিজের ও অন্যের কথা লিখল। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যের শুরু হলো। তার পাশাপাশি চারপাশের নানা কিছু নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো তাদের মনে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞানচর্চা। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশেও সেভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা শুরু হলো। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা যাক

৮.১ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাচর্চা

পৃথার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে। আজ ক্লাসে ও সেটা স্যারের কাছে জানতে চাইল। পড়াশোনা আর লেখাপড়া কি একই স্যাব? স্যার বললেন, একটু আলাদা আব্বাস বলল, কীবকম আলাদা? স্যার বললেন, পড়াশোনার মধ্যে পড়া আর শোনার কথা আছে।



কিন্তু লেখার কথা নেই অন্যদিকে লেখাপড়ার মধ্যে লেখা আর পড়ার কথা আছে। আজকাল তোমরা পড়া, শোনা ও লেখা তিনটেই করতে পারো। কিন্তু ধরো, যখন লেখার চল ছিল না, তখনতো শুনে শুনেই মনে রাখতে হতো হরপ্পার লিপি ছিল, কিন্তু সাহিত্য ছিল কিনা জানা যায় না, অবুণ বলল, জানি স্যার, হরপ্পার লিপি আমরা এখনো পড়ে উঠতে পারিনি সেলিম বলল, স্যার অনেকদিন আগে পড়াশোনা ও লেখাপড়া তাহলে কেমনভাবে হতো?

পরবর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল। তবে তাব পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলিতে এক নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন ধরনের লিপির ব্যবহার শুরু হয় ফলে মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন লিপিগুলিও ছাত্রদের শিখতে হতো। বৈদিক শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। তাকে *গুরুকুল ব্যবস্থা* বলা হতো। অন্যদিকে বৌদ্ধরা লেখাপড়া শিখত *বিহার* বা *সংঘ*। ছাত্রদের সেখানে থেকে পড়তে হতো। নতুন কতগুলি বিষয় এই সময় পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃষি, চিকিৎসা, রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ও পড়তে হতো। এই সময় *আশ্রম* নামে শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ ঘটে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো।

বৌদ্ধবিহারগুলিতে ধর্মীয় বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও পড়াশোনা হতো। সেখানে তির ও তববাবি চালানো, কুস্তি ও নানাধরনের খেলাধুলো শেখানো হতো। শ্রমণ ও ভিক্ষুদের সুতোকাটা, কাপড় বোনা শিখতে হতো। বিহারগুলিতে ছাত্রদের থাকার জন্য আলাদা ঘর থাকত। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা যাচাই কবেই নেওয়া হতো। পড়াশোনার জন্য বেতন দিতে হতো। গরিব ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশোনার কথা জানা যায় বেদের পাশাপাশি ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণ পড়ানো হতো। তাব সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, বসায়ন প্রভৃতিও পড়তে হতো। তবে মূলত ব্রাহ্মণবাই এই বিষয়গুলি চর্চা করতেন। ক্ষত্রিয়দের বোজকার শাসন চালানোর জন্য কিছু বিষয় পড়তে হতো যেমন, যুদ্ধ ও শিকার, মুদ্রা ও নথিপত্র পরীক্ষা। বৈশ্য ও শূদ্রদের ব্যবসাবাগিজ্য, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হতো। এব থেকে বোঝা যায় জীবিকার সঙ্গে পড়াশোনার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সময় থেকেই কাবিগরি বিষয়ে পড়াশোনার কথা বেশি কবে জানা যায়। কাবিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুর ভূমিকাই ছিল প্রধান। অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ছাত্ররা কোনো দক্ষ কাবিগরের কাছে যেতেন। কাবিগর-গুরুর বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত। তাঁর কর্মশালাতেই কাজ শিখত। কাজ শেষের শেষে অনেকেই গুরুর কর্মশালাতেই কাজ করত। কেউ কেউ গুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের আলাদা কর্মশালা তৈরি করত।

গুপ্তযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তবে গুরুর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার পুরোনো পদ্ধতিবও চল ছিল। এই সময় বিভিন্ন রাজবা বিদ্যালয় তৈরি কবেছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে লিপি ও ভাষা এবং বৈদিক সাহিত্য ছিল প্রধান। পাশাপাশি কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ,

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতের শিক্ষক

আচার্য ও উপাধ্যায় ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দু-ধরনের শিক্ষক। আচার্যের বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত ও খেত। আচার্যরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতেন। এবি-নিময়ে ছাত্র আচার্যকে নানা কাজে সহায়তা করত। নারীরাও আচার্য হতে পারতেন তাঁদের বলা হতো আচার্যা। উপাধ্যায়রা এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়াতেন। পড়ানোর বিনিময়ে তাঁরা বেতন নিতেন। নারী উপাধ্যায়কে বলা হতো উপাধ্যায়া। বৌদ্ধ শিক্ষায় উপাধ্যায়দের গুরুত্ব ছিল বেশি। তাঁরা বৌদ্ধ বিহারগুলিতে থেকেই পড়াতেন বৌদ্ধ ছাত্রদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিয়ম মেনে চলার শপথ করতে হতো।

নাটক, আইন, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যাও পড়ানো হতো। পেশাভিত্তিক শিক্ষার ওপরেও এ সময়ে জোব দেওয়া হয়।

কিছু কিছু বৌদ্ধবিহারকে মহাবিহার বলা হতো। দেশেব ও দেশের বাইরের বিভিন্ন ছাত্র এই মহাবিহারগুলিতে পড়তে আসত। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীল ও বলভী মহাবিহারগুলি খুবই বিখ্যাত ছিল। রাজারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র, কনৌজ, উজ্জয়িনী, মিথিলা, তাক্ষোর, কল্যাণ প্রভৃতি নগরে।

নালন্দা মহাবিহারে যে-কোনো ধর্ম ও বর্ণের ছাত্ররা পড়তে পারত। তবে তাদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে সেখানে ভর্তি হতে হতো সেখানে থাকা, খাওয়া ও পড়ার জন্য কোনো খরচ লাগত না। লেখাপড়া শেষ হবার পর নালন্দাতে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে হতো। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে ছাত্ররা নালন্দায় পড়তে আসত। নালন্দাতে সেই সময়ের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত পড়াতেন।

টুকরো কথা

তক্ষশিলা মহাবিহার

গম্ভীর মহাজনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। গ্রিক, পারসিক, কুষাণ, শক নানা বিদেশি শক্তি নানা সময়ে তক্ষশিলা দখল করে। ফলে সেখানে নানা দেশের মানুষ ও পণ্ডিত লোকের আনাগোনা ছিল। বৌদ্ধধর্ম তক্ষশিলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

দেশেব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তক্ষশিলায় যেত উচ্চশিক্ষার জন্য। যোলো থেকে কুড়ি বছর বয়সের ছাত্ররা সেখানে ভর্তি হতে পারত। ধর্ম বা বর্ণ নয় এবং যোগ্যতা যাচাই করেই ছাত্রদের নেওয়া হতো। মোটামুটি আটবছর তারা সেখানে লেখাপড়া করত। রাজা ও ব্যবসায়ীরা এই মহাবিহার চালানোর জন্য টাকাপয়সা বা জমি দান করতেন।

এখানে পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল বেশ সহজ। মনে হয় লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে লেখাপড়ার মান ছিল বেশ ভালো। এই মহাবিহারের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন জীবক, পাণিনি এবং চাণক্য।

গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অনেকটা আজকের দিনের হাতেখড়ির মতো একটি অনুষ্ঠান শুরুর হয়েছিল। তার নাম বিদ্যারম্ভ (বিদ্যা + আৰম্ভ)। পাঁচ বছর বয়সে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অক্ষর পরিচয় হতো। এই পর্যায়ে ছাত্রকে একটি পাঠ্য বই ও গণিত পড়ানো হতো।

৮.২ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য চর্চা

ভাষার ব্যবহার হয় কথা বলতে গিয়ে। আবার লিখতে গিয়েও ভাষা লাগে। তবে মুখের ভাষা আর লেখার ভাষায় অনেক তফাত থাকে। মুখের ভাষায় থাকে আঞ্চলিক টান। কিন্তু লিখতে গিয়ে সেসব ব্যবহার করা হয় না। তখন সবাই যাতে পড়ে বুঝতে পারে তেমন ভাষাতেই লেখা হয়। প্রাচীন ভারতেও মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা আলাদা ছিল। ঋকবেদের ভাষা ছন্দস্ বা ছান্দস্ ছিল বলে মনে করা হয়। সেই ভাষাতেই সবাই কথা বলত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাষায় নানা অঞ্চলের টান মিশে যেতে শুরু করে। তাতে নানা অঞ্চলের ভাষা তৈরি হতে থাকে। তাই ভাষা ও তার ব্যবহারকে নিয়মে বাঁধা দরকার। সেই নিয়ম থেকেই তৈরি হয় ব্যাকরণ। পাণিনি নামের এক পণ্ডিত তেমনই একটা ব্যাকরণ লিখলেন। তার নাম *অষ্টাধ্যায়ী*। সেখানে পাণিনি ভাষার নানান নিয়ম তৈরি করলেন। তার ফলে ভাষার সংস্কার হলো। সংস্কার হয়ে যে ভাষাটা তৈরি হলো তারই নাম সংস্কৃত।

বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাষা নানাভাবে উচ্চারণ হতে শুরু হয়। সেই ভাষাগুলোকে *প্রাকৃত* বলা হতো। প্রাকৃত বা আসল থেকে প্রাকৃত কথাটা এসেছে। ফলে পাণিনির সংস্কার করা ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা আলাদা। অন্যদিকে ছন্দস্ থেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো পালি ভাষা। প্রাকৃত ও পালি ভাষাগুলি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হলো। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লেখালেখি শুরু হয়। জৈন (প্রাকৃত) ও বৌদ্ধ (পালি) ধর্মের সাহিত্য লেখা হলো ঐ ভাষাগুলিতেই।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়তে থাকে। ফলে সমাজে বৈশ্যদের মর্যাদা বেড়ে যায়। নতুন তৈরি হওয়া নগরগুলোয় জাতি ও বর্ণের কড়াকড়ি কমতে থাকে। তাই পুরোনো জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষায় *ধর্মশাস্ত্র* লেখা চল শুরু হয়। গ্রায়ণরাই যে শ্রেষ্ঠ, সে কথাটাই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নানাভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হতো। এরা পাশাপাশি *স্মৃতিশাস্ত্র* বলে এক ধরনের লেখালেখি শুরু হয়। সেগুলিতে সম্পত্তির অধিকার ও বোজকার জীবনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করা হতো। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে রাজনীতি নিয়েও কিছু কথা থাকত। তবে ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি লেখার কাজ পবিত্রী সময়েও চলেছিল। তাছাড়া রাজনীতি বিষয়ে বই লেখার প্রচলন এই সময় হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলো *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*।

টুকায় বন্ধা

মোগলমারি বৌদ্ধবিহার

ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং এর লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় অনেকগুলো বৌদ্ধ-বিহার ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন শহরের কাছে মোগলমারিতে। প্রত্নতাত্ত্বিক ড. অশোক দত্ত ঐ বৌদ্ধ বিহারটি আবিষ্কার করেন। ঐ বৌদ্ধ-বিহারটি নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সময়েবই পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-প্রত্নস্থলের মধ্যে। এখনও এটি সবথেকে বড়ো। তবে ঐ বৌদ্ধবিহারটির নাম কী ছিল তা এখনো জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, সুবর্ণরেখা নদী ঐ বিহারটির খুব কাছ দিয়ে বয়ে যেত। মগধ থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর যাওয়ার পথের মধ্যেই বিহারটির অবস্থান। তাই ঐ বিহারটিতে বণিকদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনে হয়।

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি

ভাষা যখন লিখতে হয় তখন লাগে বর্ণ বা লিপি প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে দু-বকমেব লিপির চল ছিল খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাঁদিকে লেখা হতো ব্রাহ্মী লেখা হতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ধীরে ধীরে দেবনাগরী লিপি তৈরি হয় ধর্মীয় কাজে বা দেবতার কাজে নগবেব ব্রাহ্মণরা ঐ লিপির ব্যবহার করতেন। তাই তার নাম দেবনাগরী ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার খুব বেশি ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালেখ গুলিতে বেশিরভাগ ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেই ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার শুরু হয় ধীরে ধীরে এই লিপির নানা বদল ঘটেছিল

ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছিল। নদী ও সমুদ্র পারাপারের সময় গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে জানানোবার দবকার হতো। ফলে এই সময় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ের লেখালেখি দেখা যায়।

টুকরো কথা

রামায়ণ ও মহাভারত

রামকে নিয়ে লেখা হয়েছে যে প্রাচীন মহাকাব্য তাই রামায়ণ। রামায়ণের কবি হিসাবে বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে মোট চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে। পুরো মহাকাব্যটি সাতটি কাণ্ডে (ভাগ) ভাগ করা। এব মধ্যে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডটি সম্ভবত বাল্মীকির লেখা নয়। সে দুটি পরে রামায়ণে যোগ করা হয়েছিল রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম, সীতা ও রাবণ। রাম রাবণের যুদ্ধকে ঘিবেই রামায়ণের মূল গল্প। অবশ্য পরবর্তী সময়ে রামায়ণের নানারকম অনুবাদ হয়েছিল। সেগুলোতে গল্পের মধ্যে বেশ কিছু বদলও দেখা যায়। ঠিক কবে মূল রামায়ণ রচনা হয় তা বলা মুশকিল। তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগেই রামায়ণ রচনা হয় বলে মনে হয়। কারণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ পালি সাহিত্যে রামায়ণের গল্প দেখা যায়।

মহাভারত মহাকাব্য আসলে ভরত গোষ্ঠীর জীবন ও কাজকর্মের গল্প। মহাভারতে আদিতে আট হাজার আটশো শ্লোক ছিল। বলা হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কুবুপাণ্ডবেব যুদ্ধের কথা নিয়েই মহাভারত রচনা করেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। মহাভারতের আদিনাম ছিল জয়কাব্য বৈশম্পায়ন তাতে আরো শ্লোক যোগ করে তার নাম দেন ভারত সৌতি পবে আবো শ্লোক জুড়ে মহাভারত নাম রাখেন অর্থাৎ মহাভারত কোনো একজনের রচনা নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে মহাভারতের কথা বিশেষ জানা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে মহাভারত সংকলন হয়েছিল। মহাভারতের চর্চা করলে বেদচর্চার মতোই সুফল হবে বলা হতো। তাই মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে

মহাভারতের মূল বিষয় কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ তার পাশাপাশি ভূগোল, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিষয়েও অনেক আলোচনা রয়েছে পুরো মহাভারত আঠাবোটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ মহাকাব্য দুটি আজকের চেহারা পায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান লেখার কথা জানা যায় নাটক ও অভিনয় ছিল উঁচুতলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। ফলে নাটক ও অভিনয় বিষয়ে বিভিন্ন লেখালেখি শুরু হয়েছিল। যেমন, ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কথা বলা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় নানা রকমের সাহিত্য লেখা হয়েছিল। তখন আস্তে আস্তে সংস্কৃত ভাষা রাজদরবারে গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই সময়ে পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামে সংস্কৃতে ব্যাকরণ বই লেখেন। এই পর্যায়ের দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন অশ্বঘোষ এবং ভাস পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের কাহিনি লেখা হয়েছিল।

জৈন বা অর্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই সাহিত্য লিখত। এই সময়ে বেশির ভাগ লেখমালা প্রাকৃত ভাষায় লেখা। সাধারণত শাসনকাজ চালানো হতো প্রাকৃত ভাষাতেই। সাতবাহন রাজা হালের লেখা গাহা সওসঈ বা গাথা সপ্তশতী প্রাকৃত ভাষার একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলন।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় সাহিত্য লেখার প্রচলন এই সময়েই শুরু হয় জানা যায় যে, মাদুরাই নগরীতে তিনটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলি সঙ্গম নামে পরিচিত। সঙ্গম মানে এক জায়গায় জড়ো হওয়া। তাই তামিল সাহিত্যকে সঙ্গম সাহিত্য বলা হয়। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের অন্যতম সেবা উদাহরণ একটি কবিতা সংকলন। সেই কবিতাগুলিতে অনেক সাধারণ মানুষের কথা পাওয়া যায়। কৃষকের জীবন, গ্রামের ছবি ও নগরের নানা কথা এই কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তামিল ভাষার ব্যাকরণ চর্চাও এই সময় শুরু হয়েছিল।

চিকিৎসার নানা দিক নিয়েও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের লেখায় নানাবকম ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের কথা পাওয়া যায়। চরক-সংহিতা ও শৃশুত-সংহিতা চিকিৎসা নিয়ে লেখা দুটি বিখ্যাত বই। সেই সময় সমাজে চিকিৎসার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, চিকিৎসা শাস্ত্রকে উপবেদ বলা হতো। তাছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও বই লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬৫০ অব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তবে এই সময়ে সাহিত্য যাঁরা লিখতেন ও যাঁরা পড়তেন তারা সবাই উঁচুতলার মানুষ ছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি এই লেখাগুলি থেকে বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্রাট ও রাজাদের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হতো। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই পুরো সময়কালে মহিলা সাহিত্যিকের কথা জানা যায় না।

টুকরো কথা

পুরাণ

পুরাণ শব্দটির একটি অর্থ পুরোনো। পুরাণে সেই পুরোনো দিনের কথাই থাকে। পুরাণ সংখ্যায় আঠারোটি মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের আগেই কয়েকটি পুরাণ রচিত হয়েছিল। বাকি পুরাণগুলি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচনা করা হয়।

রাজবংশগুলির ইতিহাস পুরাণের একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। তাছাড়া কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতিও কথাও পুরাণে রয়েছে। পুরাণ গুলির সঙ্গে অনেক সময়েই ইতিহাস শব্দটিও যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ভাষাতে পুরাণ ও ইতিহাসের তফাত নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে পুরাণ হলো এমন গল্পকথা যাতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদানও মিশে রয়েছে।

টুকরো কথা

অশ্বঘোষ ও ভাস

সাধারণভাবে মনে কবা হয় অশ্বঘোষ কনিষ্কের সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন। নিজের বচনায় নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি। অশ্বঘোষ কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর বিখ্যাত বচনা হলো বুদ্ধচরিত কাব্য। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বস্তুবাই বুদ্ধচরিত কাব্যের মধ্যে ধরা আছে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের নাট্যকার ছিলেন ভাস। তাঁর কয়েকটি নাটক মহাভারত ও বামায়ণের বিষয় নিয়ে লেখা।

মুর্তি, চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের বিষয়েও সংস্কৃতে বই লেখা হয়েছিল। কিন্তু কারিগরি শিল্পের উপরে আলোচনা কোনো বইতে দেখা যায় না। গুপ্তযুগেও নাটক, অভিধান ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানান লেখাপত্রের কথা জানা যায়। কবি এবং নাট্যকার কালিদাস ছিলেন এই সময়ের সবথেকে বিখ্যাত সাহিত্যিক। শূদ্রক, বিশাখদত্ত এবং ভারবি প্রমুখও ছিলেন এই পর্যায়ের বিখ্যাত লেখক।

টুকরো কথা

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক। মৃচ্ছকটিকম কথাটির মানে হলো মাটির তৈরি ছোটো গাড়ি। মৃৎ মানে মাটি আর শকটিকা মানে ছোটো শকট বা গাড়ি। এই দুয়ে মিলে মৃচ্ছকটিকম। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চাবুদত্ত। তার ছেলে ছোট্ট বোহসেন প্রতিবেশী বণিকের ছেলেব সোনার তৈরি খেলনাগাড়ি দেখে। ঐ বকম একটি খেলনাগাড়ির জন্য বায়না ধরে বোহসেন। তখন তাকে ভোলানোর জন্য একটা মাটির খেলনাগাড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু বোহসেনের বায়না ও কান্না তাতে থামে না। এই নাটকের আবেক প্রধান চরিত্র বসন্তসেনা। বোহসেনের কান্না দেখে সে কষ্ট পায়। বোহসেনের খেলনাগাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য বসন্তসেনা নিজের সোনার গয়না দিয়ে দেয়। এই নাটকের চরিত্রগুলি সব সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনের সুখ দুঃখই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে।

বিশাখদত্তের লেখা দুটি নাটক খুব বিখ্যাত। মুদ্রারাক্ষস ও দেবীচন্দ্রগুপ্তম। নন্দরাজা ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন দখলই মুদ্রারাক্ষসের বিষয়বস্তু। গুপ্তবংশের রাজা রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শকবাজার যুদ্ধকে নিয়ে লেখা হয়েছিল দেবীচন্দ্রগুপ্তম নাটক। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও সাহিত্য লেখা হতো।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য লেখার প্রচলন দেখা যায়। তবে সেই গদ্যগুলি পালি ভাষায় লেখা গদ্যের মতো সরল ছিল না। দণ্ডীর লেখা দশকুমার চরিত সংস্কৃত গদ্যে লেখা একটি বিখ্যাত বই। ভর্তৃহরি ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক। অমরসিংহের সংকলন কবা অমরকোষ এই সময়ের একটি বিখ্যাত অভিধান। সম্রাট ও রাজারাও লেখালেখির চর্চা করতেন। জানা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধন নিজেও তিনটি নাটক লিখেছিলেন। সেগুলি হলো নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা।

চিকিৎসা বিষয়েও বই লেখা গুপ্তযুগে চালু ছিল। বাগভট্ট ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। পশু চিকিৎসা নিয়েও কয়েকটি বই লেখা হয়েছিল গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই গুপ্তযুগে লেখা হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ তামিল অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিশেষভাবে খেয়াল করা যায়। এর ফলে তামিল ভাষাতেও সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ কবিতা লেখার চল শুরু হয়। ঐ দীর্ঘ কবিতাগুলিকে তামিল সাহিত্যে মহাকাব্য বলা হতো। এমনি দুটি মহাকাব্য ছিল শিল্পাদিকাব্যম ও মণিমেখলাই তামিল কবিরামায়ণেরও নানান অনুবাদ করেছিলেন। কাম্বনের রামায়ণের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তবে কাম্বন তাঁর রামায়ণে অনেক নতুন গল্প যোগ করেছিলেন সেখানে রামের থেকে রাবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

টুকোয়া কাব্য সাহিত্যে নীতিশিক্ষা

ঠিক ভুল বিচার শেখানোর জন্য পুরোনো আমলে একধরনের বই লেখা হতো। সেই বইগুলিতে মানুষ ও বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র থাকত তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই গল্পগুলো তৈরি হতো। বিভিন্ন ঘটনায় কেমন আচরণ করা উচিত, সেটাই গল্পগুলোর মূল কথা হতো। তাই এইধরনের গল্পের বইগুলিকে নীতিশিক্ষার সংকলন বলা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা পঞ্চতন্ত্র তেমনই একটি নীতিগল্পের সংকলন সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ এর গল্পগুলি সংকলন করা হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের মূল রচনাটি পাওয়া যায়নি জানা যায় যে, একজন রাজা তাঁর ছেলেদের বোকামিতে দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন পণ্ডিত বিশ্বশর্মার কাছে ছেলেদেরকে পাঠান পড়াশোনার জন্য। বিশ্বশর্মা বিভিন্ন নীতিগল্পের মধ্যে দিয়ে ছয়মাসেই রাজার ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদতে গল্পগুলো ছোটোদেব জন্য লেখা হয়েছিল। তবে সেগুলির ভেতরে সবার জন্যই নানান বক্তব্য রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের মতেই বিভিন্ন গল্পসংকলনে নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও এধরনের নীতিশিক্ষামূলক বচনাব চল ছিল। বৌদ্ধজাতকগুলি এর বড়ো উদাহরণ। তামিল সাহিত্যেও নীতিশিক্ষার কথা পাওয়া যায়।

টুকোয়া কাব্য

কালিদাস

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন কালিদাস তবে তিনি কোন সময়ের মানুষ ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মোটামুটিভাবে মনে করা হয় তিনি গুপ্তযুগের সাহিত্যিক ছিলেন কালিদাসের জীবন নিয়ে অনেক গল্পকথাও প্রচলিত রয়েছে কাব্য ও নাটক — দুই-ই লিখেছেন কালিদাস মেঘদূতম, কুমারসম্ভবম তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত কাব্য। অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালবিকা-গ্নিমিত্রম প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। তাঁর বচনায় সেই সময়ের সমাজ ও প্রকৃতির নানাদিক ফুটে উঠেছে।



৮.৩ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞানকথাব মানে কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করা। প্রযুক্তিকথাব মানে প্রয়োগ করা। বিজ্ঞানের নানা কিছু জ্ঞান রোজকার জীবনে প্রয়োগ করা দরকার হয়। যেমন, বাড়ি বানাতে জ্যামিতির ধারণা প্রয়োগ করতে হয়। তাই বাড়ি বানাবার কাজটা প্রযুক্তির অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ আছে। এক এক সমাজে এক এক রকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দরকার হয়। ধরা যাক, একটা সমাজের মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানে না। ঐ সমাজে ধাতু বিজ্ঞান ও ধাতু প্রযুক্তির দরকার হবে না। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা ও বৈদিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ছিল। সেসব আলোচনা আগেই হয়েছে। এবারে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

টুকায় বখা

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

বামায়েণে একটা গল্প রয়েছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশেল অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ অঙ্গান হয়ে পড়েন। বৈদ্য সুশেণ বলেছিলেন ক্ষতস্থানে বিশল্যকবণী লাগিয়ে দিলেই লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিশল্যকবণী একটি ঔষধি গাছ। ঔষধি খুঁজতে হনুমান গেলেন। গন্ধমাদন পর্বতে কিন্তু বিশল্যকবণী চিনতে না পেরে পুরো পর্বতটাই তুলে নিয়ে এলেন। হনুমান বিশল্যকবণী লাগানোর ফলে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিশল্যকবণী কথাব মানে বিশেষ রূপে শল্যকবণের পর্ব (অস্ত্রোপচারণের পর্ব) যে ওষুধ লাগানো হয়। আদতে এটা গল্প হলেও, চিকিৎসার প্রসঙ্গটা জবুবি।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরির নানা দিক

চিকিৎসা বিজ্ঞান
ও প্রাণী বিজ্ঞান

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান
ও জ্যোতিষ

ধাতু বিজ্ঞান ও
রসায়ন বিজ্ঞান

কৃষি বিজ্ঞান

স্থাপত্য বিজ্ঞান
ও কারিগরি বিজ্ঞান

পরবর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের কথা রয়েছে। চরক সংহিতায় প্রায় সাতশো ঔষধি গাছপালায় কথা পাওয়া যায়। এই বইতে রোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। একটি আদর্শ হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত তার বিবরণ চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। হাড় ভেঙে গেলে, বা নাক, কান ইত্যাদি কেটে গেলে তা জোড়ার কাজে শল্য চিকিৎসকরা ছিলেন অত্যন্ত পটু। এই বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন শূশ্রুত।

ঔষধে বন্ধা জীবক

জীবক ছিলেন বুদ্ধের সময়কালের বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বিম্বিসারের রাজবৈদ্য। তাঁর জন্ম রাজগৃহে হলেও, তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে গুবু আশ্রয়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

শিক্ষা শেষ হবার পর গুবু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন আশেপাশের এলাকা থেকে ভেষজগুণহীন গাছপালা জোগাড় করে আনতে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবক বাদে অন্য সবাই নমুনা জোগাড় করে ফিরে আসে। অনেক পরে জীবক খালি হাতে ফিরে এলে গুবু অবাক হন। এর কারণ জানতে চাইলে জীবক বলেন, ভেষজগুণহীন কোনো গাছ তাব নজরে পড়েনি। এই উত্তরে গুবু খুশি হন। তিনি বুঝতে পারেন ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি সম্বন্ধে জীবকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। জীবক রাজা বিম্বিসার ও গৌতম বুদ্ধকে বেশ কয়েকবার কঠিন বোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

জাতিভেদ প্রথা কঠোর হবার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বলা হতো আগের জন্মে পুণ্য করলে পরের জন্মে বোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এধরনের কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিরোধী ছিল। বোগ সাবাত্রে গেলে নানান বকম খাদ্যের কথা বলা ছিল। অথচ সেই খাদ্যের অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রের মতে খাওয়া বারণ ছিল। ফলে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন সময় বিরোধ তৈরি হয়েছিল। শূশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শবব্যবচ্ছেদ বা মড়াকাটা। অথচ ধর্মশাস্ত্রের মতে শব বা মৃতদেহ ছোঁয়া নিষেধ ছিল। ফলে মড়াকাটা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য শারীরবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার চর্চা ধীরে ধীরে কমে গেল। বাগভট্ট-এর পর থেকে শল্যচিকিৎসার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া চিকিৎসকরা বোগী ব্রাহ্মণ না শূদ্র তাব বিচার করতেন না। ফলে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথাব সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার বিরোধিতা তৈরি হয়।

???

ভেবে দেখো

বৌদ্ধ মতে চরক প্রথম কনিষ্কেব আমলের লোক ছিলেন তাহলে চরক সংহিতা কি চরক নামে কোনো ব্যক্তির লেখা? চরক কথাটির মানে যাবা ঘুরে বেড়ায়। বেদের একটি শাখা চারণ-বৈদ্য বা ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসকদের কথা পাওয়া যায়। তাহলে কী চরক সংহিতা ঐ বকম ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার সংকলন?

শূশ্রুত কোন সময়ের লোক ছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। শূশ্রুত কথাটির মানে যিনি বা যাঁরা ভালো করে শুনছিলেন। তাহলে শূশ্রুত সংহিতাও কি ঐরকম চারণ-বৈদ্যদের অভিজ্ঞতার সংকলন?

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষচর্চা দীর্ঘদিন একসঙ্গে চলেছিল। জৈন ও বৌদ্ধরাও গণিতের চর্চা করতেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি মিলিয়ে বৌদ্ধদের গণিতবিজ্ঞান তৈরি হয়েছিল। জৈনরা তাকেই বলতেন *সংখ্যাযন*। সেই সময়ে পড়াশোনায় গণিতের স্থান ছিল সামনের সারিতে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই গণিতের চর্চা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন ছিলেন একজন গণিতবিদ।

গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছিল। যদিও গুপ্ত যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকটাই জ্যোতিষচর্চার কাজে ব্যবহার হতো। আর্যভট্ট গণিতকে একটি আলাদা চর্চার বিষয় করে তুলেছিলেন। *আর্যভট্টীয়* বইতে গণিত, সময় ও গ্রহ-লক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর্যভট্ট। সেই বইতে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ব্যবহার করেন তিনি। সেই চর্চা থেকেই দশমিকের ধারণাও শুরু হয়েছিল। আর্যভট্ট বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার ও নিজের অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে তাঁর মতে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আর্যভট্টের পরবর্তীকালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন বরাহমিহির। *সূর্যসিদ্ধান্ত* ও *পঞ্চসিদ্ধান্তিকা* বইতে বরাহমিহির পুরোনো ধারণার অনেক বদল করেছিলেন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তার আগাম লক্ষণ কী কী, তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আবার ভূমিকম্পের আগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক লক্ষণ বিষয়ক আলোচনাও বরাহমিহিরের লেখায় পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর হাতেই প্রাচীন ভারতের গণিত সবথেকে বেশি বিকশিত হয়েছিল। *ব্রহ্মসিদ্ধান্ত* তাঁর একটি বিখ্যাত বই।

প্রাচীন ভারতে খনি ও ধাতু বিজ্ঞানও ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, গয়না ও মূর্তি এর প্রমাণ। ধাতু বিজ্ঞানের উন্নতির উদাহরণ মেহরোলির লোহার গুপ্তটি। গুপ্তটিতে আজও মরচে পড়েনি। তবে ধাতু

ছবি. ৮.১

মেহরোলির লোহার গুপ্ত



বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন লেখাপত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি। ধাতু গলানোর কাজ বসায়নের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার হতো। পাশাপাশি সুগন্ধি দ্রব্য ও খাদ্য তৈরিতেও বসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কৃষিই ছিল বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা। তাই কৃষিকাজ ও গাছপালা নিয়ে আলোচনাও বিজ্ঞানচর্চাও আওতায় পড়েছিল। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে। কৃষির পাশাপাশি পশুপাখি নিয়েও বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রাচীন ভারতে হতো বলে জানা যায়।

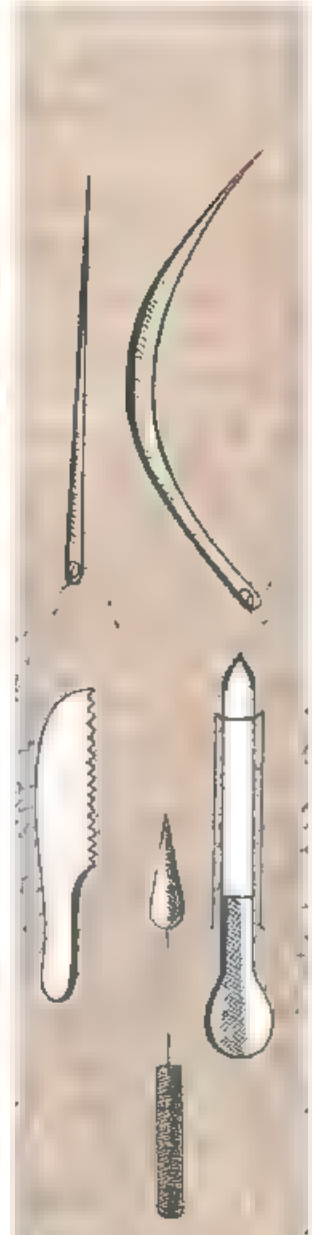
ইট, পাথর ও ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার সঙ্গে ছিল নানা রকম যন্ত্র তৈরির কৌশল। তার থেকেই কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতির দিকটাও স্পষ্ট হয়। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিকিৎসকরা নিজেরা তৈরি করতেন না। দক্ষ কারিগরদের বিশেষ করে কামারের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো। *শুশ্রূত সংহিতায়* বলা হয়েছে দক্ষ কামারের সঙ্গে চিকিৎসককে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেমন হবে তা কারিগরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই মতো কারিগর যন্ত্র তৈরি করে দেবেন। ধাতু ও দামি পাথরের বিচার ও পবন কবাও বিজ্ঞানের অংশ বলে ধরা হতো। খনি ও পাথরের বিষয়ে চর্চা ছিল বিজ্ঞানের আওতায়। বিভিন্ন ধাতু মেশানো এবং আলাদা করার চর্চাও হতো।

শুশ্রূত সংহিতায় কারিগরদের ও হাতের কাজকে প্রশংসা করা হয়েছে বলা হয়েছে। হাতই প্রধানতম যন্ত্র। অথচ ধর্মশাস্ত্রে কারিগরদের কাজকে নেহাতই হেয় করা হয়েছে। তাব ফলে ধীরে ধীরে কারিগরি শিল্পচর্চা বিজ্ঞানচর্চা থেকে আলাদা হয়ে গেল। যদিও স্থাপত্য বানানোর কারিগরি শিল্প নষ্ট হয়ে যায়নি। ধর্মীয় প্রয়োজনেই বেশির ভাগ স্থাপত্য বানানো হতো। ফলে সেগুলি ছিল মন্দির ও মঠ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সে ধরনের স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল।

টুকায় বন্ধা

প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবেশ চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল বন, গাছপালা ও পশুপাখি। বন থেকে নানারকম সম্পদ পাওয়া যেত। ফলে বনের প্রতি শাসকদের বিশেষ নজর দিতে হতো। *অর্থশাস্ত্রে* বিভিন্নরকম বন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বনের ক্ষতি করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা আছে। সম্রাট অশোক বেশ কিছু পশুপাখি মারতে নিষেধ করেছিলেন।



ছবি ৮২

শুশ্রূত সংহিতা অনুযায়ী
শল্যচিকিৎসার কয়েকটি
যন্ত্রপাতি

১১১

ভেবে দেখো

প্রাকৃতিক পরিবেশ
নষ্ট হওয়ার জন্য কী
কী বিষয় দায়ী বলে
তোমার মনে হয়?
আজকের পরিবেশ
বাঁচাতে তোমরা দল
বোঁধে কী কী কাজ
করতে পারো, তার
তালিকা বানাও

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ কৃষিকাজ ও নগর বসতি বাড়তে থাকে। ফলে জঙ্গল (অরণ্য) কাটা শুরু হয়। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় গ্রাম হলো চেনাজানা অঞ্চল অন্যদিকে জঙ্গল হল অচেনা। জঙ্গলে থাকা মানুষজনও অদ্ভুত। জঙ্গলবাসীদের প্রায় সবসময়ই নীচু কবে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যে দেখানো হয়েছে রাজপরিবারের কাউকে বিপদে ফেলার জন্য জঙ্গলে পাঠানো হতো বনের পশুপাখি শিকারের অনেক উদাহরণ লেখাগুলিতে আছে। জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাও সেখানে পাওয়া যায়। বাক্সসরা অনেকে বনেই থাকতেন। তারা ঋষিদের উৎপাত করতেন। রাজারা বাক্সসদের হাত থেকে ঋষিদের রক্ষা করতেন। নগর যত বাড়তে থাকে, জঙ্গল ততই কমতে থাকে। তাই বিভিন্ন সময় গাছ বাঁচানোর নানান উপায় তৈরি করা হতো। যেমন, বট অশ্বথ গাছকে পূজা করার চল শুরু হয়। তাই এসব গাছ তখন আর কাটা যেত না।

রাজকীয় জীবনে, কৃষিকাজে ও নানা ধর্মীয় কাজে জল ছিল খুব জরুরি। তাই জল ধরে রাখা, জলসেচ ও জলাশয় তৈরি নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন জলাশয় তৈরি করিয়ে দিতেন। তবে আজকের তুলনায় সেযুগে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। ফলে পরিবেশের ওপর চাপও কম পড়ত।

৮.৪ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা

আদিম মানুষ একসময় গুহায় থাকতো। পরে এক সময়ে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকত তারা। তাতে দেয়ালগুলো দেখতেও সুন্দর হতো। অনেক পরে মানুষ বাড়ি বানাতে শুরু করেছিল। প্রয়োজন মতো কাঠ, পাথর, মাটি, ইট দিয়ে নানাবকম স্থাপত্য বানিয়েছে মানুষ। তার পাশাপাশি বানিয়েছে নানাবকম ভাস্কর্য। আর এঁকেছে ছবি। এইসব মিলিয়েই প্রাচীন আমলে শিল্পচর্চা চলতো। তার সঙ্গে হবেরকম কারিগরি শিল্পের প্রচলনও ছিল।

প্রাচীন সমাজে স্থাপত্যগুলো মূলত দু-বকম কাজের জন্য বানানো হতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য স্থাপত্য বানানোর চল ছিল। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠতো। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বানানো স্থাপত্য। বিরাট ইমারত বানানো হতো শাসকের ক্ষমতা বোঝানোর জন্য। বাড়ি, প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য ছিল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। ধর্মীয় কারণে বানানো স্থাপত্যগুলি সব মানুষ ব্যবহার করতে পারতেন। বণিক, ব্যবসায়ীরাও স্থাপত্যের জন্য অর্থদান করতেন। কখনো আবার সাধারণ মানুষ স্তূপ বা মন্দির বানানোর সাহায্য করতেন।



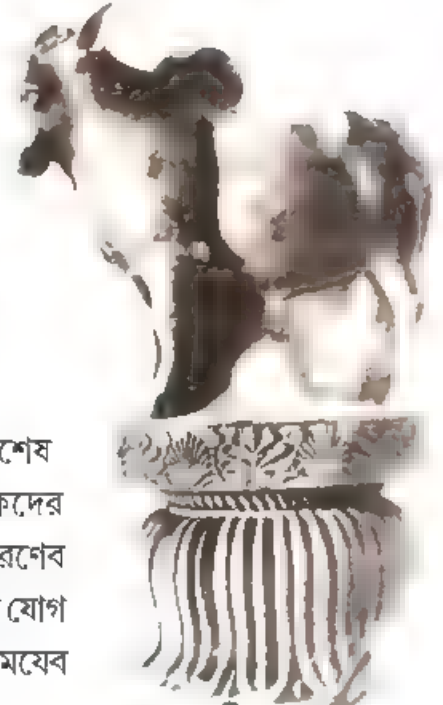
ছবি ৮৪:
অশোকস্তম্ভ, সারনাথ



মৌর্য শিল্পের অন্যতম নজির অশোকের আমলে বানানো পাথরের স্তম্ভগুলি। স্তম্ভগুলির গায়ে কখনো কখনো লেখ খোদাই করা হতো। একটি পাথর থেকেই স্তম্ভগুলি তৈরি হতো। অশোকস্তম্ভ অনেকটা চক-খড়ির মতো দেখতে। স্তম্ভের ভিত মাটিতে পোঁতা থাকত। কোনো ঠেকা ছাড়াই স্তম্ভগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত। একটা মাত্র পাথর কেটেই তৈরি হতো বলে স্তম্ভগুলোকে মূলত

ভাস্কর্য বলা যেতে পারে। স্তম্ভের একেবারে ওপরে বসানো থাকত একটা প্রাণীর মূর্তি। সিংহ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি সেক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। এই জাতীয় পাথরের স্তম্ভ মৌর্য যুগের আগে দেখা যায়নি। এমনই একটি বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ সারনাথে রয়েছে।

মৌর্য যুগের শিল্পে মানুষের মূর্তি বিশেষ দেখা যায়নি। মৌর্য শিল্প মূলত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছিল। জনসাধারণের জীবন যাপনের সঙ্গে মৌর্য শিল্পের বিশেষ যোগ ছিল না। তাই মৌর্য শিল্পের ছাপ পরবর্তী সময়ের শিল্পে বিশেষ দেখা যায় না।



ছবি. ৮.৪.

অশোকস্তম্ভ, রামপুরা

সুঙ্গ-কুষাণ-সাতবাহন আমলে শিল্পচর্চা

মৌর্যদের পরবর্তী যুগে ভাস্কর্য বানানোর কাজে পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ফলে সেই সময় শিল্পচর্চা পুরোপুরি শাসকের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। সুঙ্গ, কুষাণ ও সাতবাহন আমলে সাধারণ জীবনের ছাপ শিল্পের উপর পড়েছিল। তবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও শিল্পের যোগাযোগ ছিল। এই সময় ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেরা নজির স্তূপ, চৈত্য ও বিহার। প্রধানত বৌদ্ধধর্মচর্চার সঙ্গেই এই স্থাপত্য শিল্পগুলি জড়িত। তবে জৈন ধর্মেও স্তূপ বানানোর নজির রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্থাপত্যের নজির এই আমলে খুবই সামান্য।

সুঙ্গ-কুশাণ যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আমলের শিল্পে রাজদরবারের সরাসরি প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। তবে প্রকৃতি এবং রোজকার জীবনের নানা দিক ভাস্কর্য শিল্পে ফুটে উঠেছে। তোরণের ভাস্কর্যগুলি অনেক সময় যেন একটি টানা গল্প বলে চলেছে।

শক-কুশাণ যুগে গন্ধার ও মথুরার শিল্পরীতি ছিল খুব বিখ্যাত। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই দুই শিল্পরীতির মূল বিষয়। গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত গ্রিক ও রোমান প্রভাব দেখা যায়। মথুরা রীতির ভাস্কর্যে লাল চুনাপাথরের বেশি ব্যবহার হতো।

ছবি ৮.৬:
সুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির
ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়



ছবি ৮.৭:
ভারহুতের ভাস্কর্য



ছবি ৮.৮:
গৌতম বুদ্ধ, মথুরা শৈলী



ছবি ৮.৯:
অমরাবতীর ভাস্কর্য

ছবি ৮.১০: গৌতম বুদ্ধের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য, গন্ধার ভাস্কর্য



টুকুয়ে বধ্য স্তূপ-চৈত্য-বিহার

জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ তাঁর দেহাবশেষের উপর স্তূপ বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্ধ-গোলাকার মাটির টিবিগুলোই ছিল মৌর্য যুগের আগের স্তূপ। মৌর্য পরবর্তী সময়ে স্তূপ বানানো সংখ্যায় অনেক



ছবি ৮১১.

সাঁচী স্তূপ ও স্তূপের ভিতরের
দেয়ালে বুদ্ধের একটি ভাস্কর্য



বেড়ে যায়। স্তূপের চারদিকে চারটি বড়ো দরজা থাকত সেগুলিকে তোষণ বলা হয় তোষণগুলিতে ভাস্কর্য খোদাই করা হতো। স্তূপের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উপাসনা করার জন্য পথও থাকত শাসক ও ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্তূপগুলি তৈরি হতো ভারহুত, সাঁচী ও অমবাবতীর স্তূপগুলি স্থাপত্য হিসাবে বিখ্যাত স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হতো চৈত্য। সরাসরি পাহাড় কেটে গুহাবাস হিসাবেই বেশিরভাগ চৈত্য বানানো হতো চৈত্যের আকার হতো লম্বাটে ধরনের চৈত্যের শেষ প্রান্তে উপাসনার জন্য একটি স্তূপ থাকত। সাতবাহন যুগে নাসিক, পিতলখোবা, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্য বানানো হয়েছিল

বৌদ্ধ বিহার বা সংঘাবামগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার ও পড়াশোনার জন্যই বিহারগুলি তৈরি হতো। বিহারগুলি আদতে ছিল অনেকগুলি গুহার সমষ্টি। পরবর্তীকালে ইট দিয়ে বিহার তৈরি করা হতো।



ছবি ৮১২

অজন্তার চৈত্য গুহা

ছবি ৮১৩

নালন্দা মহাবিহারে
সারিপুত্ত স্তূপ





ছবি ৮ ১৯ সুজগ আমলের রাজপরিবার,
↓ টেবাকেটা, বাংলা, খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

ছবি ৮ ১৮ ও ৮ ২০
সাঁচী স্তূপের পূর্বদিকের তোবনের গায়েব ভাস্কর্য ↑↓



ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :

- ১.১) নালন্দা, তক্ষশিলা, বলভী, পাটলিপুত্র।
- ১.২) ব্রাহ্মী, সংস্কৃত, খরোষ্ঠি, দেবনাগরী
- ১.৩) রত্নাবলী, মুচ্ছকটিকম, অর্থশাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম।

২। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

- ২.১) নালন্দা মহাবিহারে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়তে পারত।
- ২.২) কব্ধনের রামায়ণে বামকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।
- ২.৩) বাগভট ছিলেন একজন চিকিৎসক।
- ২.৪) কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল

৩। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

মহাবলীপুরম	কুষাণ যুগ
গন্ধার শিল্পরীতি	নাগার্জুন
গণিতবিদ	তামিল মহাকাব্য
মণিমেখলাই	গুহাচিত্র
অজন্তা	বথের মতো মন্দির

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৪.১) প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মিল-অমিলগুলি নিজের ভাষায় লেখো।
- ৪.২) চবক সংহিতায় আদর্শ হাসপাতাল কেমন হবে, তা বলা আছে। তোমার মতে একটি ভালো হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত?
- ৪.৩) একটি বিহার ও স্তূপের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো

৫। হাতেকলমে করো :

মাটি, থার্মোকল দিয়ে চৈত্য/বিহার/স্তূপের মডেল তৈরি করো।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

বুঝির বাড়ি যেতে সবাই সবসময় বাজি। বুঝির দাদু এতরকম গল্প বলেন। মজাব মজাব খেলা
 শেখান। কয়েকদিন ধবেই দাদু ওদের নিয়ে একটা মজাব খেলা খেলছেন। একটা ইয়া বড়ো পৃথিবীর



মানচিত্র মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কত জায়গার নাম। তার সঙ্গে নদী-পাহাড় সব কিছু। এবারে সবাই কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যায়। তারপর একদল অন্যদলকে একটা নাম বলে। যেটা খুঁজতে হয় মানচিত্রে। পারলে পয়েন্ট পাওয়া যায়। না পারলে পয়েন্ট কাটা যায়। এভাবে চলতে থাকে খেলা। সবাই মশগুল হয়ে খেলে। আর খেলার শেষে বোঝে কত কিছু শেখা হলো, আবার খেলাও হলো।

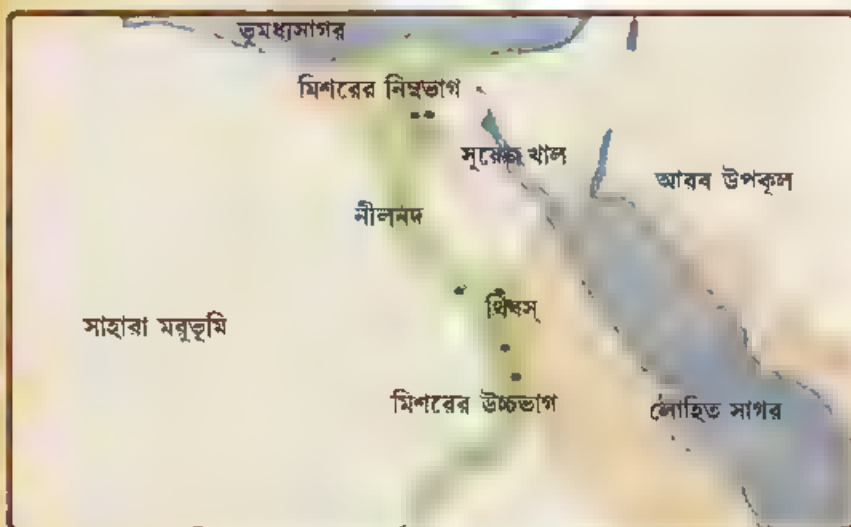
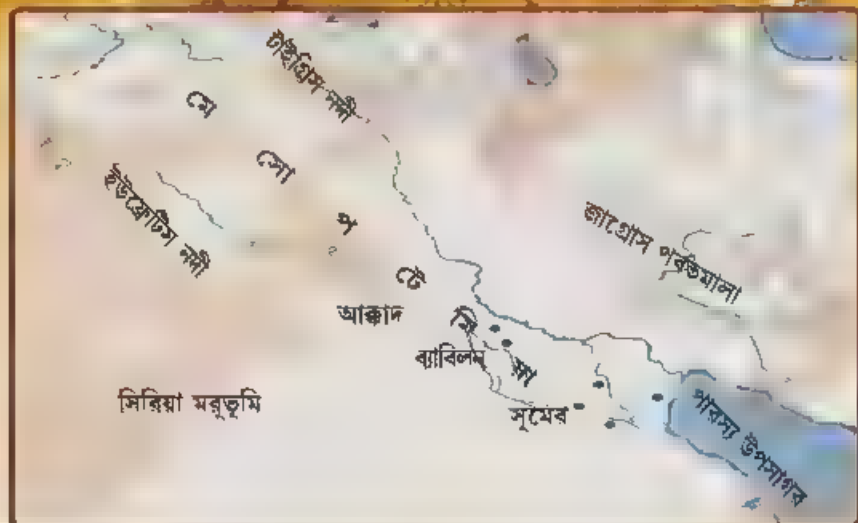
একদিন খেলার মাঝে সুবাইয়া দাদুকে প্রশ্ন করল। আচ্ছা দাদু, এই যে মানচিত্রে এত দেশ, এসব কী প্রাচীন যুগে ছিল? দাদু বললেন, পৃথিবীর মানচিত্র বাববাব বদলেছে। যে দেশগুলো এখনকার মানচিত্রে দেখছ প্রাচীন যুগে সেগুলো ছিল না। এখনকার অনেকগুলো দেশ বা অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছিল সে যুগেব একেকটা সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলির মধ্যে যোগাযোগও ছিল। প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির কথা তো জেনেছ। ঐ সময়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় অন্যান্য সভ্যতার কথাও কিছুটা তোমাদের জানা। সেই সভ্যতাগুলির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির যোগাযোগ নানাভাবে গড়ে উঠেছিল।

পরদিন ইতিহাস ক্লাসে পলাশ দিদিমণিকে দাদুর কথাগুলো বলল। দিদিমণি বললেন, হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে ঐ সময়ের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগের কথা আগেই জেনেছ। সেই যোগাযোগ তার পরবর্তী সময়েও ছিল। তবে যোগাযোগের নানা রকম দিক ছিল। এবারে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন।

ভারতীয়
উপমহাদেশের
সভ্যতাগুলির
সঙ্গে বিশ্বের
অন্যান্য
সভ্যতার
যোগাযোগ



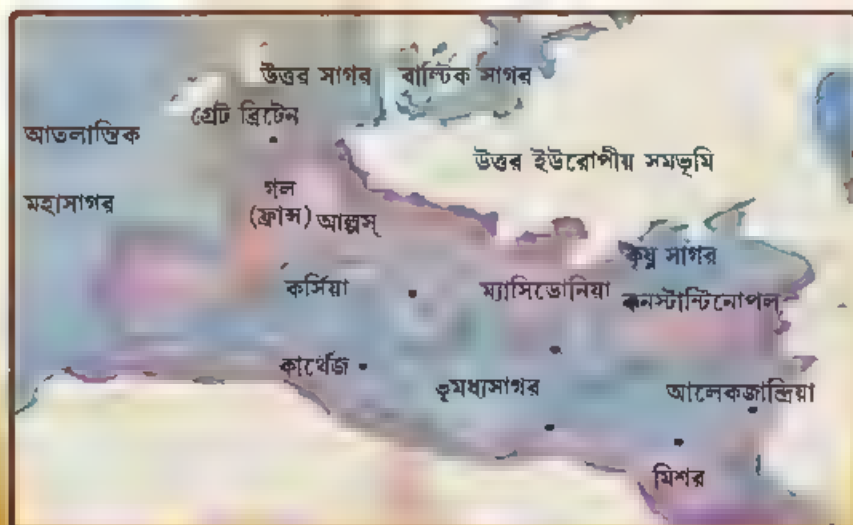
প্রাচীন মেসোপটেমিয়া
অঞ্চল ও সুমের, ব্যাবিলন
প্রভৃতি সভ্যতা



মানচিত্র.৯.১:
প্রাচীন বিশ্বের

প্রাচীন মিশর অঞ্চল
ও মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য



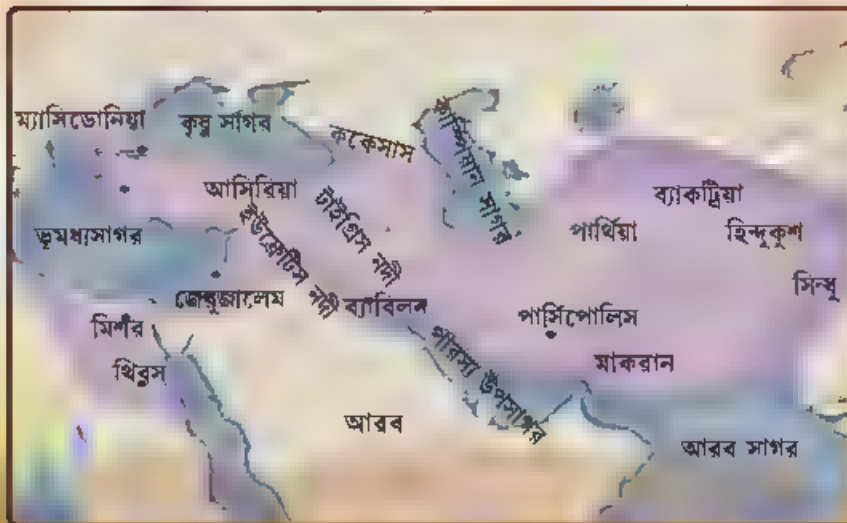


প্রাচীন চীন সভ্যতা

কয়েকটি সভ্যতা



প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা



প্রাচীন রোমান সভ্যতা

টুকরো কথা এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা

□ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানের অঞ্চলকে গ্রিকবা বলতো মেসোপটেমিয়া। ঐ শব্দটির মানে দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। □ প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের একটা অংশে ছিল সুমেরীয় সভ্যতা। □ সুমেরের লিপিকে ইংরেজিতে বলে কিউনিফর্ম। □ সুমেরের লোকেবা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করত। □ সুমেরের লোকেবা প্রথম কাঠের চাকাব ব্যবহার শুরু করেছিল। □ সুমের ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার আরেকটি বিখ্যাত সভ্যতা হলো ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। ব্যাবিলনের রাজা হামুবাবি প্রথম লিখিত আইন চালু করেছিলেন।

○ উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় নীল নদের তীর বরাবর ছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে বলেছিলেন নীলনদের দান। ○ মিশরের শাসকদের ফারাও বলা হতো। তাদের মৃতদেহ রাখার জন্য পিরামিড বানানো হতো। ○ মিশরে প্যাপিরাস গাছের ছালে লেখা শুরু হয়। প্যাপিরাস থেকেই কাগজের ইংরেজি শব্দ পেপার এসেছে। ○ বর্ণ ও ছবি মিলিয়ে মিশরে একবকম লেখার ব্যবহার হতো। তাকে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ লিপি বলা হয়। ○ মিশরের ল্যাপিস লাজুলি পাথর ভারতীয় উপমহাদেশে আমদানি করা হতো।

□ এশিয়া মহাদেশের পূর্বে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায় ছিল প্রাচীন চীন সভ্যতা। □ প্রথম কাগজ বানানোর ও কাঠের হরফ বানিয়ে ছাপার কৌশলও চিনেই তৈরি হয়েছিল। □ বাইবের আক্রমণ ঠেকাতে চিনের শাসকরা পাঁচিল দিয়ে সাম্রাজ্য ঘিরে বেখেছিলেন। সেই বিরাট পাঁচিলগুলিকে একসঙ্গে চিনের প্রাচীর বলা হয়। □ চিনে বাবুদের ব্যবহার হতো।

○ পাহাড়ে ঘেবা গ্রিসে অনেকগুলি ছোটো ছোটো বাস্তু গড়ে উঠেছিল। সেগুলিকে বলা হতো নগর বাস্তু বা পলিস। পলিসগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। তাদের সঙ্গে পারসিক সাম্রাজ্যের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের কথা গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং লেখায় পাওয়া যায়। ○ এথেন্স ও স্পার্টা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করেছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস সেই যুদ্ধের কথা লিখেছিলেন। ○ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো। পারসিক ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ গ্রিক সভ্যতায় পড়েছিল।

□ পারস্য উপসাগরের উত্তরে গড়ে উঠেছিল বিরাট পারসিক সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পারসিক সংস্কৃতিও ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। □ কুবুশ ও প্রথম দবায়বৌষ ছিলেন দুজন বিখ্যাত পারসিক সম্রাট।

○ ভূমধ্যসাগরের ইটালির উপকূল ঘিরে ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতা। ধীরে ধীরে রোমানরা বিরাট সাম্রাজ্য বানিয়েছিল। ○ গ্রিসের ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ রোমের সভ্যতায় পড়েছিল। রোমে রাজনীতি, আইন, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের নানা উন্নতি হয়েছিল। ○ রোমের রাজকর্মচারীর আদেশেই জেরুজালেমে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়।

এই সভ্যতাগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

পারসিক শাসক তৃতীয় দরায়বৌষ-এব (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩০ অব্দ) সময়ে আলেকজান্ডার পারস্য অভিযান করেন। তাতে পারসিকরা হেরে যায়। ফলে হখামনীযীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। গম্বার ও নিম্ন সিন্ধু এলাকাতেও আর পারসিক অধিকার রইল না।



ছবি.৯.২: পার্সিপোলিস নগরের ধ্বংসাবশেষ

উপমহাদেশের সামান্য অংশেই পারসিক শাসন ছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তার নানাবকম প্রভাব পরেও দেখা যায়। হখামনীযীয়বা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে স্যাট্রাপদের নিয়োগ করতেন। পরবর্তী সময় শক ও কুষাণ শাসকবাও স্যাট্রাপ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। তাদের সময় স্যাট্রাপবা হয়ে গিয়েছিল ক্ষত্রপ। তাছাড়া শাসকবা সবারবি তাদের প্রজাদের কাছে সবকারি আদেশ-নির্দেশ প্রচার করতেন লেখর মাধ্যমে। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রায় একইভাবে সাম্রাজ্যে লেখর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রচার করতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও গ্রিসের যোগাযোগ

গ্রিক শাসক আলেকজান্ডার পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই পারসিকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। পারসিকদের হারিয়ে আলেকজান্ডার পৌঁছে যান ভারতীয় উপমহাদেশে। উপমহাদেশে পারসিক শাসন শেষ হয় আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে। এবিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আলেকজান্ডার বেশি দিন উপমহাদেশে ছিলেন না। ফলে ঐ অভিযানের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে খুব গভীরভাবে পড়েনি। আলেকজান্ডারের অভিযানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু শাসক লড়াই করেছিলেন। আবার অনেক শাসক গ্রিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তক্ষশিলার রাজা অশ্তি আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করেন। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ছোটো ছোটো শক্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই মগধের ক্ষমতা বিস্তার সহজ হয়



ছবি ৯ ৩: আলেকজান্ডারের একটি সোনার মুদ্রার দু পিঠ

খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ নাগাদ মধ্য এশিয়ার যাবাব গোষ্ঠীর আক্রমণে ব্যাকট্রিয়ায় গ্রিক শাসন শেষ হয়। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়রা। উপমহাদেশে তারা সেক বা শক নামে পরিচিত ছিল। আব ছিল ইউয়ে-ঝি বা কুষাণ। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে তারা ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছেছিল। কাশ্মীর, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের এলাকা ও তক্ষশিলা শকদের দখলে ছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোড়ার দিকে কাবুল এলাকা পার্থীয়দের হাতে চলে যায়। পার্থীয়রা ইবান থেকে উপমহাদেশে এসেছিল। পার্থীয়রাই উপমহাদেশে পহুব নামে পরিচিত ছিল।

শক শাসনের বাধা ছিল পহুব শাসকরা। পহুব রাজা গভোফারনেস আনুমানিক ২০ বা ২১ খ্রিস্টাব্দে শাসন শুরু করেন। সম্ভবত শকদের হাতিয়ে প্রাচীন গন্ধারের এক অংশ তিনি দখল করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পুরো সিন্ধু উপত্যকা গভোফারনেসের অধীনে ছিল। ফলে বিরাট অঞ্চলের শাসক হিসেবে তিনিও নিজের মুদ্রায় *বাজাধিবাজ* উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আমলে সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য উপমহাদেশে এসেছিলেন। কুষাণ শাসন শুরু হওয়ার ফলে শক ও পহুবদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। মূলত পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে শক শাসন টিকে ছিল।

উপমহাদেশ ও বাইরের পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল দূত বিনিময়। মূলত মৌর্য সম্রাটদের সময় থেকেই সেই দূত বিনিময় শুরু হয়েছিল। সেই দূতেরা অনেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলেন।



গ্রিক শাসক সেলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গিয়েছিলেন। ঐ একই সময়েই সেলিউকাসের দূত হয়ে মৌর্য দরবারে গিয়েছিলেন ডায়ামাকাস। মিশরের শাসক টলেমি ডায়োনিসিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে মৌর্যদের কাছে। মৌর্য সম্রাটরাও তাঁদের দূত পাঠাতেন বিদেশি শাসকদের সভায়।

বিন্দুসাবের সঙ্গে সিরিয়ার শাসক প্রথম অ্যান্টিওকস-এর যোগাযোগ ছিল। বিন্দুসাব নাকি গ্রিক বাজার কাছে কয়েকটি জিনিস ও একজন পণ্ডিত চেয়েছিলেন। সিরিয়ার শাসক সব জিনিস পাঠালেও পণ্ডিত পাঠাননি। এই ঘটনা কতটা বাস্তব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বোঝা যায় পশ্চিম এশিয়ার গ্রিকদের সঙ্গে মৌর্যরা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

সম্রাট অশোক উপমহাদেশের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় অশোক দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজগৃহে পাওয়া একটি লেখ থেকে হর্ষবর্ধনের সময় চিনের সঙ্গে দূত বিনিময়ের বিষয়ে জানা যায়।



টুকরো কথা

হুণ আক্রমণ

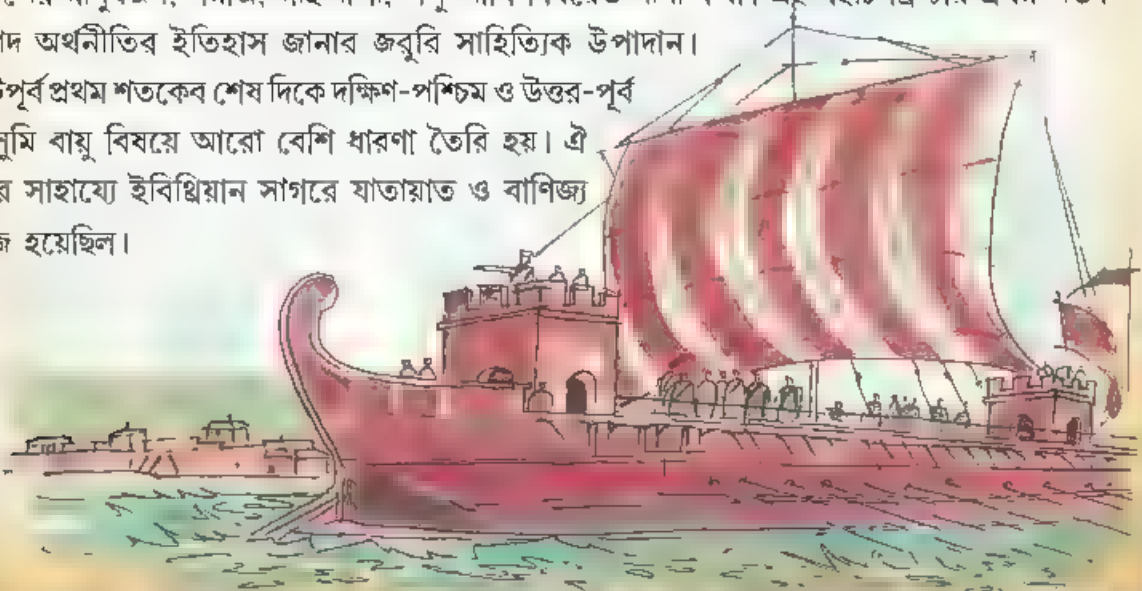
আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে হুণরা ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান করেছিল। তখন ক্ষম্ভগুপ্তের শাসন কাল। তিনি হুণ অভিযানকে সফলভাবে আটকে দিতে পেরেছিলেন। তাবপব অনেক দিন হুণ অভিযান উপমহাদেশে হয়নি। পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় হুণরা আবার শক্তিশালী হয়। সেসময় তাদের নেতা ছিলেন তোবমান এবং মিহিরকুল। উপমহাদেশের কিছু অঞ্চলে তোবমানের শাসন ছিল। তোবমানেবে ছেলে মিহিরকুল (৫২০-৫৩৫ খ্রি.) ছিলেন ক্ষমতাবান শাসক। হুণরা গুপ্ত শাসনের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হুণশাসনের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার স্থল-বাণিজ্য ভাটা দেখা দেয়।

টুকুয়ে বন্ধা পেরিপ্লাস ও মৌসুমি বায়ু

ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ভূগোলে ইরিথ্রিয়ান সাগর বলা হতো। সেই ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি বই লেখা হয়েছিল। তার নাম *পেরিপ্লাস অভ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী*। পেরিপ্লাস কথাটাব দুটো মানে হয়। জলযানে কবে ঘুরে বেড়ানো। আবার জলপথে যাতায়াতের বর্ণনা। সেভাবে ধবলে বইটির নামের বাংলা মানে হতে পারে ইরিথ্রিয়ান সাগরে এমণ। বইটির লেখকের নাম জানা যায় না। বইটি গ্রিক ভাষায় লেখা। বইটির লেখক একজন গ্রিক, যিনি মিশরে থাকতেন।

বইটি লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন। তাই বইটিতে ইরিথ্রিয়ান সাগরের বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। বণিকদের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছিল বইটি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে বইটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন, সমাজ, গাছপালা, পশু-পাখি বিষয়েও নানা কথা। এই বইটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ অর্থনীতির ইতিহাস জানার জবুরি সাহিত্যিক উপাদান।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বিষয়ে আরো বেশি ধারণা তৈরি হয়। ঐ বায়ুর সাহায্যে ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য সহজ হয়েছিল।



সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই উপকূলের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে রোমের বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর ছিল নর্মদা নদীর মোহনায় ভূগুকচ্ছ। উত্তরের কোঙ্কন উপকূলে বেশ কয়েকটি বন্দর ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল কল্যাণ বন্দর। শক শাসক নহপান ঐ বন্দরটি অবরোধ করেছিলেন। মালাবার উপকূলের বন্দরগুলি দিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার বাণিজ্য চলত। এখনকার তামিলনাড়ু উপকূলেও ছিল বেশ কিছু বন্দর। কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকায় বিখ্যাত বন্দর ছিল কাবেরীপট্টিনম। অম্ব উপকূলেও কয়েকটি বন্দরের কথা জানা যায়। সেখানে সম্ভবত জাহাজ ছাড়ার জায়গাও ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরো পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব ছিল।

১১১

ভেবে দেখো

এই পুরো বই জুড়ে
প্রাচীন বাংলার কোন
কোন অঞ্চলের নাম
বয়েছে তার একটা
তালিকা বানাও। এই
অঞ্চলগুলি কী কী
কারণে বিখ্যাত ছিল?

টুংগা বন্ধু

বন্দর-নগর : তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পরিচিত বন্দর-নগর ছিল তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামেও এই নগরের পরিচয় দেওয়া হতো। বিদেশি লেখকদের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত (গ্রিক) নামও পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের কাজকর্ম জারি ছিল। সুয়ান জাং বলেছেন, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের একটি খাঁড়ির উপরে বয়েছে। সেখানে স্থলপথ ও জলপথ এসে মিশেছে। সম্ভবত, সেটি ছিল এখনকার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকব কাছাকাছি। এই বন্দর থেকেই ফারিসিয়ান জাহাজে উঠেছিলেন। স্থলপথেও তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করা সহজ ছিল। বাণিজ্য ছাড়া তাম্রলিপ্ত নগর পড়াশোনার কারণেও বিখ্যাত ছিল। তবে নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ায় ফলে বন্দর-নগরটির গুরুত্ব কমে থাকে। নগর হিসাবেও তার খ্যাতি নষ্ট হয়।

৯.১.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম

উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেলামেশার মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতো। এর ফলে উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি এই জাতি-উপজাতিগুলির অনেকে মিশে গিয়েছিল উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

পারসিক সাম্রাজ্যের অধীন এলাকাগুলিতে আবারমীয় ভাষা ও লিপি চলত। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই ভাষা ও লিপি ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকও এই অঞ্চলে আবারমীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহার করেন। এই আবারমীয় লিপি থেকে সম্ভবত খরোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়েছিল। দুটি লিপিই ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হতো। পারসিক শাসকরা উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানাতেন। সম্ভবত তার প্রভাব পড়েছিল মৌর্য শাসকদের উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানানোর ভাবনায়। আলেকজান্ডার পারসিক সাম্রাজ্যের পার্সিপোলিস নগরী ধ্বংস করে দেন। তার ফলে পারসিক শিল্পীরা অনেকেই উপমহাদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। এই শিল্পীদের হাতে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য শিল্প শুরু হয়েছিল।

আলেকজান্ডার ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি নগর তৈরি করেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ও সেই নগরগুলি ছিল। সেগুলিতে গ্রিকরা থাকত। ধীরে

যীবে ঐ গ্রিকরা উপমহাদেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। তারা বৌদ্ধধর্মের চর্চাও করতে থাকে। অন্যদিকে গ্রিকদের থেকে নতুন ধরনের মুদ্রা তৈরি কবতে শিখেছিল উপমহাদেশের মানুষ। ইন্দো-গ্রিকরা উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা চালু করেন। বিজ্ঞান বিশেষত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও ক্ষেত্রে গ্রিক ও ভারতীয় ভাবনাচিন্তার বিনিময় দেখা যায়। তাছাড়া ঐ সময় গ্রিক প্রভাবিত শিল্পের চর্চাও শুবু হয়েছিল। যার অন্যতম উদাহরণ হলো গন্ধার শিল্প।

টুকরো কথা গন্ধার শিল্প

গন্ধার প্রদেশে নানা কারণে বিভিন্ন জাতির মেলামেশার সুযোগ ছিল। সেই মেলামেশার ছাপ ঐ অঞ্চলের শিল্পেও পড়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে ঘিরে গন্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল। আগে বুদ্ধের মূর্তি বানানো ও পূজা করা নিষিদ্ধ ছিল। গন্ধারের শিল্পীরা নতুন ধরনের বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করেন। নাক টিকালো, টানা ভুবু ও আধবোজা চোখ মূর্তিগুলি বৈশিষ্ট্য। মূর্তির পায়েব জুতোগুলিও রোমান জুতোর মতো দেখতে হতো। সোনালি বংয়ের ব্যবহারও মূর্তিগুলিতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে গন্ধার শিল্পে গ্রিক ও রোমান শিল্পের ছাপ দেখা যায়। যদিও গন্ধার মূর্তিগুলি পিছনে ভাবনাচিন্তা ছিল ভারতীয় রীতির। পাশাপাশি ইরানীয় ও মধ্য এশীয় শিল্পের ছাপও গন্ধার শিল্পে পড়েছিল। গন্ধার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে নানান শিল্পের প্রভাব সেখানে মিলেমিশে গিয়েছিল।

শক শাসকরা নানাবকম বুপোর মুদ্রা চালু করেন। কয়েকটি মুদ্রায় গ্রিক ও প্রাকৃত দুই লিপিতেই লেখা হতো। শক শাসক মোগ নিজের মুদ্রায় রাজাতিরাজ উপাধিও ব্যবহার করেন। ঐ উপাধিটি খেয়াল রাখা দরকার। রাজাধিরাজ থেকেই উপাধিটি এসেছে। শক শাসক বুদ্ধদামনের জুনাগড় প্রশস্তি সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম বড়ো লেখ। তাব আগে সব লেখই প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

শক-পহ্লব ও কুষাণদের জীবনযাপনের নানা উপাদান উপমহাদেশের জীবনযাপনে ছাপ ফেলেছিল। আবার তাবাও উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়েছিল। যুদ্ধবীতি, পোশাক, ঘব-বাড়ি ও সংস্কৃতির নানা কিছুতেই সেই বিনিময়ের নজির আছে।

শক-পহ্লবরা যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহারকে উন্নত কবেছিল। পহ্লবরা চলন্ত ঘোড়ায় বসে পিছনে ঘুরে তিব ছোঁড়ার কাযদা চালু করে। উপমহাদেশে ঘোড়া



ছবি. ৯ ৭: গৌতম
বুদ্ধ, গন্ধার শৈলী



টুকরো বস্তু

জ্যোতির্বিজ্ঞান- চর্চায় বিনিময়

ভারতীয়, গ্রিক, ব্যাবিলন ও রোমান জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা একে অন্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা একটি বিখ্যাত বই ছিল যবনজাতক। বইটি আদতে গ্রিক ভাষায় লেখা। আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেটি সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। তই তার নামে যবন কথাটা পাওয়া যায়। এর থেকে গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের দেওয়া - নেওয়ার বিষয়টা বোঝা যায় বরাহমিহিরের পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা বইটিতেও সেই প্রভাবের নজির রয়েছে। সেখানে বরাহমিহির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করেছেন। পৌলিশ সিদ্ধান্তটি গ্রিস ও রোমক সিদ্ধান্তটি রোম থেকে এসেছিল।

লাগাম ও জিনের ব্যবহার শুরু করেছিল শক পহুবরা কুষাণবাও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে খুব পটু ছিল।

শক-কুষাণবা উপমহাদেশে নানাবকম পোশাক চালু করেছিল যেমন, জামা, পাজামা, লম্বা জোকা, বেল্ট, জুতো প্রভৃতি। শক ও কুষাণ আমলে নগরের পাঁচিলগুলি তৈরি হতো ইট দিয়ে। তাছাড়া একধরনের লাল মাটির পাত্র কুষাণ আমলে বানানো হতো। ঐ মাটির পাত্র বানাবার পদ্ধতি মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশে এসেছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আসা এইসব শাসকবা অনেকেই বিষ্ণুর উপাসক হয়ে পড়েন আবার অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কুষাণরা শিব, বিষ্ণু ও বুদ্ধের উপাসনা করেছিলেন। কুষাণদের মুদ্রায় গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত ছিল। আগে গৌতমবুদ্ধের কোনো মূর্তি পূজা হতো না। বুদ্ধের কোনো প্রতীক বা চিহ্নকে সামনে বেখে পূজা করা হতো।

উপমহাদেশের নাটকের চর্চা উপবেও গ্রিক প্রভাব পড়েছিল। নাটকের মঞ্চ বানানো, পর্দার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। নাটকের পর্দাকে সংস্কৃতে যবনিকা বলা হয়। গ্রিকরাই এই পর্দা ফেলার প্রথা চালু করেছিল। তাদের যবন নাম থেকেই যবনিকা শব্দটি তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার প্রতিও এই শাসকদের অনেকে উৎসাহী ছিলেন।

ধীরে ধীরে এইসব বিদেশি জাতি-উপজাতিগুলি উপমহাদেশের সমাজে মিশে গিয়েছিল। তাদের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধাশ্রেণি বলে মনে করা হতো। তবে গ্রাথগণদের চোখে তাবা ছিল নীচু শ্রেণির ক্ষত্রিয়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বাইবেব জগতের যোগাযোগের আরেকটি মাধ্যম ছিল। অনেক পণ্ডিত শিক্ষক উপমহাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যেতেন, শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা করতে বাইবে থেকে শিক্ষার্থীবাও আসতেন। এইসব দেশের মধ্যে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচাৰ বেড়েছিল।

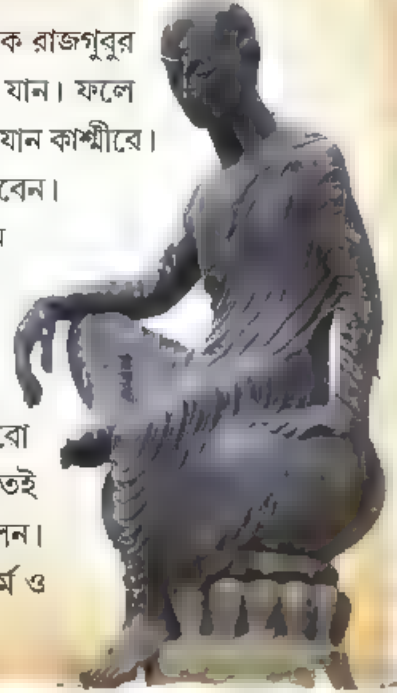
ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা হতো। বুদ্ধযশ ছিলেন তেমনই একজন কাশ্মীরি বৌদ্ধ পণ্ডিত। পড়াশোনা শেষে তিনি মধ্য এশিয়ার কাশগড়ে চলে যান। কুমারজীবের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত পবমার্থও চিনে গিয়েছিলেন পড়াশোনার কারণে। অনেক বৌদ্ধ সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনে পৌছোন। বাকি জীবন সেখানেই থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাচর্চা করেন।

টুকুয়া বখা কুমারজীব

ছবি ৯৮

কুমারজীবের মূর্তি, কিজিল গুহা,
কুচি প্রদেশ, চীন

কুমারজীবের বাবা কুমারায়ান কুচিতে চলে গিয়েছিলেন। কুচিব রাজা তাঁকে রাজগুবুর পদ দিয়েছিলেন। কুমারজীবের জন্মের পরে তাঁর মা জীব বৌদ্ধ হয়ে যান। ফলে ন-বছরের কুমারজীব (৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ- ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) মায়ের সঙ্গে চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে বশুদত্তের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করেন। পড়াশোনা শেষে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোবন কুমারজীব ততদিনে পণ্ডিত হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন কিছু দিন পরে চীনের শাসক কুচি আক্রমণ করেন। কুমারজীব তখন কুচিতে ছিলেন। ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুমারজীবকে কুচি থেকে কান-সু প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চীন সম্রাটের অনুবোধে ৪০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীনের রাজধানীতে যান। পরবর্তী এগারো বছর কুমারজীব চীনের রাজধানীতেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পড়াশোনাতেই তাঁর জীবন কেটেছিল সংস্কৃত ও চীনা দু-ভাষাতেই কুমারজীব দক্ষ ছিলেন। ফলে অনুবাদের কাজ খুব সহজেই তিনি করতে পারতেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কুমারজীবের ভূমিকা বিখ্যাত।



ভারত থেকে চীনে শিক্ষকদের যাতায়াতের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে চীনের উৎসাহ তৈরি হয়। সেই উৎসাহের ফলেই চীন থেকে বেশ কিছু মানুষ ভারতে আসতে থাকেন। তাঁরা ভারতে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরেও দেখেছিলেন। তাও-নান নামের এক চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভারতে আসার উৎসাহ দিয়েছিলেন তার রেশ ধরেই ভারতে এসেছিলেন ফাসিয়ান। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচজন সহসন্ন্যাসী সমেত ফাসিয়ান ভারতে পৌঁছোন। তিনি কাশ্মীর হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। পরে উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা করেছিলেন ফাসিয়ান। দু-বছর তিনি তাম্রলিপুত্রেও ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ফো-কুয়ো-কি বইতে তিনি লিখেছিলেন। দেশে ফেরার সময় ভারত ও সিংহল থেকে অনেক বৌদ্ধপুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন ফাসিয়ান।

ফাসিয়ানের পরে আরও অনেক পণ্ডিতই চীন থেকে উপমহাদেশে পড়াশোনার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা অনেকেই নালন্দা মহাবিহারে থেকে পড়াশোনা করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়েও চর্চা হতো। তাছাড়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ও শিক্ষা নিতেন তাঁরা।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম দিকে চীন থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন সুয়ান জাং ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি উপমহাদেশে পৌঁছোন। হর্ষবর্ধন তখন কনৌজ শাসন করছিলেন পরবর্তী চোন্দো বছর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান সুয়ান জাং। নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে পড়াশোনা করেন তিনি।

ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর ভারতীয় উপমহাদেশে ভ্রমণ পথ



ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো



১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :

- ১.১) ভৃগুকচ্ছ, কল্যাণ, সোপারা, তাম্রলিপ্ত।
- ১.২) বৃন্দযশ, কুমারজীব, পরমার্থ, সুয়ান জাং।
- ১.৩) আলেকজান্ডার, সেলিউকাস, কনিষ্ক, মিনান্দার।

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
নকস-ই রুস্তম	সিরিয়া
ভৃগুকচ্ছ	প্রথম দরায়বৌষ
প্রথম অ্যান্টিওকস	নর্মদা নদী

৩। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ৩.১) হেরোডোটাসের মতে ইন্দুস ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি — (প্রদেশ / দেশ / জেলা)।
- ৩.২) ইন্দো-গ্রিক বলা হতো — (শকদের/ব্যাকট্রিয়ার অধিবাসীদের/ কুষাণদের)।
- ৩.৩) সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন — (আলেকজান্ডার/ মিনান্দার/ গভোফারনেস)-এর আমলে।

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৪.১) আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কি মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার উপরে কোনো প্রভাব ছিল?
- ৪.২) শক-কুষাণরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী কী বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না।
- ৪.৩) প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পড়াশোনার কী ভূমিকা ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৫। হাতেকলমে করো :

- ৫.১) নবম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির মিল ও অমিলগুলি খুঁজে বার করো।
- ৫.২) ৯.২ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন? কোন কোন জায়গায় দুজনেই গিয়েছিলেন? তার একটি তালিকা তৈরি করো।

তোমার পাতা



ইতিহাস পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা কেমন হলো? কতটা আনন্দ, কতটা মজা পেলে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা জেনে? আর কী কী থাকলে আরো মজায় ও আনন্দে ইতিহাস জানা যেত? তোমার সেরা ভাবনা এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর শেষে

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির ষষ্ঠ শ্রেণিতে পৃথক বিষয় হিসাবে ইতিহাসচর্চা শুরু হবে। সেই মতো পঠন-পাঠনের জন্য অতীত ও ঐতিহ্য বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি, তালিকা এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। বইতে মূল উচ্চারণের দিকে নজর রেখে নানা স্থান ও ব্যক্তিনাম এবং সিন্ধু নদের পাঁচটি নদীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত অন্য নামগুলিও বলা যেতে পারে যেমন: ক) ইন্দাস / সিন্ধু, বিলাম/ বিতস্তা, চেনাব/ চন্দ্রভাগা, সাটলেজ/ শতদ্রু, রাভি/ ইরাবতী, বিয়াস/ বিপাশা। খ) মূল চিনা ভাষার উচ্চারণ বজায় রেখে নিনোজ নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-ফা হিয়েন /ফাসিয়ান, হিউয়েন সাঙ/সুয়ান জাং। গ) ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য প্রাক, ঋক্ প্রভৃতি শব্দে হসন্ত (্) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ৮৫টি ‘টুকরো কথা’ শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ২১, ৩৯, ৫২, ৫৬, ৭৪, ৯২, ১০৮, ১১২, ১২১ এবং ১৪৪ পৃষ্ঠার ‘টুকরো কথা’ অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের (প্রথম অধ্যায়ে) প্রাথমিক কিন্তু বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-রাজড়াদের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসকবংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের

বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিববাল করে দেবেন।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে *আদিম মানুষের নানারকম* শীর্ষক টুকরো কথায় মানুষের বিবর্তনের চারটি মূল পর্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও ঐ পর্বগুলির মধ্যে মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব রয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেই পর্বগুলিও সহজ সাবলীলভাবে তুলে ধরতে পারেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা, মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মনে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ তৈরির জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নস্থল এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রহালয় (মিউজিয়াম) প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা করা যেতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যলি ও অভিনব তথ্য সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে **ভেবে বলো** শীর্ষক এবং অধ্যায়ের শেষে **ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**-র অন্তর্গত হাতেকলমে শীর্ষক কৃত্যলিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী **‘ভেবে দেখো খুঁজে দেখো’** দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসত্তার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করেছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানের সূত্র ধরে অতীতের কোনো বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে)। (বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।